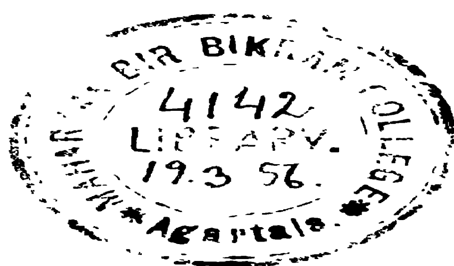
উর্মিমালা

ঊর্মিমালা

বনফুল



শান্তি লাইব্রেরী
কলিকাতা :: এলাহাবাদ



উর্মিমালা

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৬২

প্রকাশক : অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি লাইব্রেরী

১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

৮১, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ-৩

মুদ্রাকর : অজিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট : সুবোধ দাশগুপ্ত

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

তিন টাকা

বিজয়িনী

খুব লম্বা ঘোমটা টেনেই সুবাসিনী ট্রেন থেকে নাবল। ট্রেনে ঘোমটা টানবার প্রয়োজন হয়নি। প্রথম শ্রেণীর যে কামরাটিতে সে উঠেছিল তাতে আর কেউ ছিল না। তাই যে ছদ্মবেশে সে পুরন্দরপুরে গিয়ে বিজয় মল্লিকের বাসায় উঠবে ঠিক করেছিল, সেটাকে আরও ভালো করে' ঠিক করে' নেবার সুযোগও পেয়েছিল সে ট্রেনেই। ছদ্মবেশ অবশ্য তেমন চমকপ্রদ কিছু নয়, সাধারণ বৈষ্ণবীর বেশ। গলায় কণ্ঠী, নাকের উপর রসকলি, গায়ে নামাবলী। বিজয় মল্লিকের কুলগুরুর কাছ থেকে চিঠিও একখানা জোগাড় করে' এনেছিল সে। সে আশা করেছিল, বিজয় মল্লিক এ চিঠির অমর্য্যাদা করবেন না। যদিও ধার্ম্মিক বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় বিজয় মল্লিক সে পর্য্যায়ের লোক নন, মদ আর মেয়েমানুষ নিয়েই জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে তাঁর, তবু কিন্তু তাঁর অন্তরের গহন প্রদেশে এমন একটা কিছু আছে যা তাঁকে নাস্তিক হ'তে দেয়নি। তিনি দেব দ্বিজ, মাদুলী কবচ, সিন্নি, স্বপ্ন সবই মানতেন, কেবল মুখে নয় অন্তরের সহিতই। কলেজের ইংরাজী শিক্ষা তাঁর মনের কুসংস্কারগুলোকে দূর তো করতেই পারেনি বরং যেন দৃঢ়তর করেছিল। সুবাসিনী একথা জানত, তাই সে কৌশল করে' কুলগুরুর চিঠিখানি হস্তগত করে' এনেছিল। সে জানত, এ চিঠির অমর্য্যাদা বিজয় মল্লিক করবেন না। এ-ও সে জানতো যে, বিজয় মল্লিক যদি তাকে হঠাৎ দেখেও ফেলেন, তাহলেও চিনতে পারবেন না। বিশ বছর আগে যে সুবাসিনী তাঁর হৃদয় হরণ করেছিল— সে আর নেই। সে বদলে গেছে, মরে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ঈষৎ স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়ার মধ্যে তার কোনও চিহ্নই আর নেই, বিজয় মল্লিকের প্রথম যৌবনের সহচরী তন্বী সুবাসিনী কালের আবর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে তলিয়ে

গেছে। একটা চিহ্ন অবশ্য আছে। উল্কি দিয়ে বিজয় মল্লিক সুবাসিনীর বুকে নিজের নামটা লিখেছিলেন একদিন, সেটা এখনও লুপ্ত হয়নি। কিন্তু সেটা দেখবার সুযোগ কাউকে কখনও দেয়নি সে, দেবার ইচ্ছেও নেই। তিন-পুরু জামার নীচে তা লুকোনো আছে। বিজয় মল্লিককে অন্তত সুযোগ সে কখনও দেবে না। যে প্রেমে বিহ্বল হ'য়ে তিনি তার বুকে নিজের নাম লিখিয়ে ছিলেন আর যে প্রেমের উপর বিশ্বাস ক'রে সে সেটা লিখতে দিয়েছিল, সে প্রেমেরই যখন মর্য্যাদা রইল না, তখন ওই তুচ্ছ চিহ্নের মূল্য কি। সম্ভব হ'লে ওটা সে মুছেই ফেলত, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সুবাসিনীর চেয়ে হীনতর মনোবৃত্তির কোনও স্ত্রীলোক হয়তো ওটা নিয়ে আস্ফালন করত, সুবাসিনী করেনি। সুবাসিনী আলাদা জাতের মেয়ে। বিজয় মল্লিক তাকে ত্যাগ করে' যখন অন্য আর একজনকে নিয়ে মাতলেন, তখন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাকে দশ হাজার টাকাও দিয়েছিলেন। সে টাকা নাটকীয় ভঙ্গীতে সে ফেরত দিতে পারত, দেয়নি। সে টাকা, খরচও করে নি সে। বিজয় মল্লিক তার নামে একটা বড় ব্যাংকে দশ হাজার টাকা জমা করে' তাকে পাশ বুক আর চেক বুক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আজ পর্য্যন্ত একটি চেকও কাটেনি সে। টাকা ব্যাংকেই পড়ে আছে। এটা সম্ভব হয়েছিল অবশ্য তাব স্বামীর জন্য। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি। পদস্খলিতা সুবাসিনীকে ঘরে স্থান দিয়েছিলেন তিনি, সে যে বিজয় মল্লিকের রক্ষিতা রূপে কিছুকাল অন্যত্র ছিল—এ ঘটনাটাতে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি যেই আবিস্কার করলেন যে বিজয় মল্লিক সুবাসিনীকে ত্যাগ করে চলে গেছে অমনি তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিলেন। এমন মহৎ লোককেও কিন্তু সুবাসিনী ভালবাসতে পারেনি। কারণও ছিল এর। এখনও সে বিজয় মল্লিককেই ভালবাসে।

ট্রেন থেকে নেমেই সে পরের ষ্টেশনের একটি টিকিট কিনে ফেললে। উদ্দেশ্য ওয়েটিং রুমে কিছুক্ষণ থাকবে। একটু বিশ্রাম করে' নিয়ে তারপর পুরন্দরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে গরুর গাড়ি করে। পৌছতে রাত হয়ে যাবে, তা হোক, দিনের আলোয় পুরন্দরপুরে পৌছবার ইচ্ছা হ'ল না তার। প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে কেউ ছিল না। সুবাসিনী স্নান করে, খাওয়া

দাওয়া শেষ করে' শুয়ে পড়ল। রাতে ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি। ঘুমটা কিন্তু প্রগাঢ় হ'ল না, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন এল। তার যে বিগত জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে সে সারাটা পথ এসেছে সেই বিগত জীবনেরই খানিকটা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠল, তার স্বপ্নে। এমন সজীব মূর্ত্ত হ'য়ে উঠল যেন কালকের ঘটনা।

বিজয় মল্লিক—যুবক বিজয় মল্লিক, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, টকটকে রঙ, বাসনা-প্রদীপ্ত দৃষ্টি, সযত্ন লালিত গোঁফ—সুন্দর সুপুরুষ বিজয় মল্লিক তার ঘরে প্রবেশ করলেন, রোজই যেমন করতেন, রাত্রি ন'টার পর। যা বললেন, তা প্রত্যাশাই করছিল সুবাসিনী। রোজই এসে প্রথমে গান করতে বলেন, সেদিনও বললেন। গানটা শেষ হয়ে যাবার পর চোখ বুজে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর চোখ খুলে নির্ণিমেষে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

"কি দেখছেন অমন করে ?"

"তোমাকে আর দেখতে পাব না কি না, তাই ভাল করে দেখে নিচ্ছি—" কথাটা হেঁয়ালির মতো শুনিয়েছিল প্রথমে।

"তার মানে—?"

"তোমার স্বামী চিঠি লিখেছেন বিশ্বপতিকে—"

"কি লিখেছেন ?"

"লিখেছেন, তুমি যদি ঘরে ফিরে যাও তাহলে তিনি তোমাকে ঘরেই স্থান দেবেন। ত্যাগ করবেন না। তুমি যে আমার কাছে আছ এ খবর তিনি জানেন, কিন্তু কাউকে জানান নি। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা জানে যে তুমি বাপের বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছ। ভদ্রলোক মুশকিলে পড়েছেন মেয়েকে নিয়ে। তোমার যে মেয়ে ছিল তাতো জানতাম না। কত বড় মেয়ে ?—"

চুপ করে রইল সুবাসিনী খানিকক্ষণ, তারপর বলল, "বছর খানেকের।" ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন বিজয় মল্লিক।

তারপর হেসে বললেন—"তাহলে বাড়ীই ফিরে যাও তুমি। এসব জানলে তোমার সঙ্গে এতটা মাখামাখি করতাম না, বিশ্বপতি আমাকে

কিছুই বলেনি এসব। অন্তত তোমার বুকে নিজের নামটা লেখাতাম না তাহলে। বল তো ওটা তুলেও দিতে পারি। একটু হয়তো কষ্ট হবে—"

বিজয় মল্লিকের নির্ব্বিকার ভাবভঙ্গী দেখে নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছিল সুবাসিনী। সে যেন মানুষ নয়, একটা খেলনা। কিন্তু এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করেনি সে। কেমন যেন আত্মসম্মানে বেধেছিল। পেটের মেয়েটার জন্য অবশ্য মন কেমন করত তার—খুবই মন কেমন করত—সুযোগ থাকলে হয়তো তাকে নিয়েই আসত সে—কিন্তু সুযোগ ছিল না। বিশ্বপতির সঙ্গে গভীর রাত্রে সে যখন গৃহত্যাগ করেছিল তখন মেয়ের কাছে শুয়েছিলেন স্বামী। তাঁকে না জাগিয়ে মেয়েকে আনা সম্ভব ছিল না। সে যে সামান্য একটা খেলনা মাত্র, এ ধারণাটা বেশীক্ষণ কিন্তু স্থায়ী হয়নি তার মনে—মেয়ের কাছে ফিরে যাবার সুযোগ এসেছে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই আনন্দেই বিভোর হয়ে গিয়েছিল সে, উৎসুক হয়ে উঠেছিল তার মন।

"উল্‌কিটা তুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব ? স্বামীর কাছে ফিরে যাচ্ছ, ওটা থাকা ঠিক নয় !"

স্বামীর আচরণ কি হবে তা না জেনেই নিদারুণ সত্য কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন।

"স্বামীর কাছে আর ফেরা যাবে না—"

"আমার কাছেই থাকবে তাহলে ?"

"তাই বা থাকব কি করে ! বিশ্বপতিবাবু বলছিলেন, ময়না বাঈজিকে আপনি বহাল করেছেন—"

"করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাকে রাখতে পারতাম ! কিন্তু আমার একটা কুসংস্কার আছে। পরস্ত্রীকে আমি সব সময়ে মা বলে ভাবতে পারি না যদিও, কিন্তু যে পরস্ত্রী সত্যি সত্যি মা হয়ে গেছে, তার সংগে আর সংশ্রব রাখতে ইচ্ছে হয় না। আমাদের কুলগুরুর নিষেধও আছে। তাই তোমাকে ছাড়তে যদিও কষ্ট হচ্ছে খুব, তবু উপায় নেই, ছাড়তেই হবে। তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও তুমি, তিনি যখন এ নিয়ে কোনও গোলমাল করবেন না বলেছেন। একটু আশ্চর্য্য লাগছে যদিও কথাটা শুনে, এদেশে সাধারণত

এরকমটা হয় না। তবু যাও! যদি ভদ্র ব্যবহার করেন ভালোই, আর না যদি করেন তাহলে নিজেই একটা ব্যবস্থা কোরো কিছু। আমি লয়েড্সে তোমার নামে দশ হাজার টাকা জমা করে দিয়েছি, ব্যাংকে গিয়ে কেবল তোমাকে টেস্ট্ সিগ্নেচার প্রভৃতি করতে হবে। বিশ্বপতি নিয়ে যাবে তোমাকে। যদি দরকার হয় আরও কিছু দেব। টাকা দিয়ে যতটা করা সম্ভব তা আমি করব।" আবার নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন বিজয় মল্লিক তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বললেন, "কোথা থেকে কি ঘটল দেখ। তোমার মামার বাড়ীর ঠিক পাশেই যদি আমার মামার বাড়ী না হ'ত, আর তোমার সঙ্গে সেখানে যদি আমার ঘনিষ্ঠতা না হ'ত তাহ'লে এসব কিছুই হ'ত না। ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কিছু হ'ত না যদি বিয়েটা হয়ে যেত। কিন্তু বাদ সাধল কুষ্ঠি। তোমার কুষ্ঠির সঙ্গে আমার কুষ্ঠির মিল তো হলই না, তাছাড়া তোমার বৈধব্য যোগ ছিল, আমাদের কুলগুরু কিছুতেই রাজী হ'লেন না! যদি হ'তেন, তাহলে এসব কিছুই হ'ত না। আরও যোগাযোগ দেখ, বিশ্বপতি তোমার স্বামীর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বেরিয়ে গেল। তার কাছেই খবর পেলাম তোমাকে একজন নিঃসন্তান বুড়ো পণ্ডিত বিয়ে করেছেন—যাক্ ওসব কথা ভেবে আর লাভ নেই—"

এ স্বপ্নটা মিলিয়ে গেল, এল আর একটা স্বপ্ন।

তার স্বামী যেন তাকে বলছেন, "আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম পুত্রার্থে। কিন্তু তোমার হ'ল একটা মেয়ে। তারপর তুমি কালীঘাট যাবার নাম করে' পালিয়ে গেলে বিশ্বপতির সঙ্গে। গিয়ে রইলে একটা লম্পট জমিদারের ছেলের উপপত্নী হয়ে। সে দিন কতক তোমাকে ভোগ করে' এখন আর একটা বাঈজি নিয়ে মেতেছে, তোমার বিপদ আসন্ন দেখে বিশ্বপতি আমার ভাগ্নে সুরেনকে এক মিথ্যে কাহিনী রচনা করে চিঠি লিখেছে যে তুমি নাকি কোলকাতার রাস্তায় হারিয়ে গিয়েছিলে, এতদিনে তোমাকে খুঁজে পেয়েছে

সে, কিন্তু যেহেতু তুমি না বলে' বাড়ী থেকে চলে এসেছ তাই তোমার ফিরতে ভয় করছে। আমি যদি অভয় দি তাহলে তুমি ফিরে আসবে। আসল কথা অবশ্য আমি সব জানতাম। আমার বাড়ীতে যদি দ্বিতীয় লোক থাকতো তাহলে তোমাকে আমি ফিরে আসতে বলতুম না, কিন্তু এই কচি মেয়েটাকে একা সামলাবার সামর্থ আমার নেই, এজন্যও বটে আর আমার বংশকে কেলেঙ্কারীর কলঙ্ক থেকে বাঁচাবার জন্যেও বটে তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি আবার। এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করিনি। করবও না। কিন্তু অসতীর সঙ্গে আমি সহবাসও করব না। বুড়োও হয়েছি, আমি কাশী চললাম। ঘর-দোর বিষয়-সম্পত্তি যা কিছু আছে সব রইল, তুমি পার তো বাকী জীবনটা ভদ্রভাবে কাটিয়ে মেয়েটিকে মানুষ কোরো। আমি আর ফিরব না।"

স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। ঘুমও ভেঙে গেল। উঠে বসল সুবাসিনী। পুনর্জন্ম হ'ল যেন তার। বিশ বছর আগেকার তার জীবন আবার যেন দেখা দিয়ে গেল তাকে। "স্বামীর কাছে আর ফেরা যাবে না"—বিশ বছর আগে উচ্চারিত এই ভবিষ্যদ্বাণী মর্মান্তিকভাবে সফল হয়েছিল। স্বামী কাশী থেকে আর ফেরেন নি। কাশীতেই দেহ-রক্ষা করেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর সুবাসিনী আর গ্রামে থাকেনি। স্বামীর বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে' চলে' এসেছিল কোলকাতায়। সেইখানেই সে এতদিন ধরে' আছে, সযত্নে মানুষ করেছে মেয়েটিকে। বাধা সৃষ্টি করবার মতো কেউ ছিল না শ্বশুরকুলে। পিতৃকুলে বা মাতৃকুলে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে চাননি। তাঁদের ভয় ছিল পাছে একটা বিধবার ভার তাঁদের কারো ঘাড়ে পড়ে' যায়। ঝাড়া-হাত-পা বিধবা নয়, একটা মেয়েও আছে। সুতরাং সুবাসিনী নিজের ব্যবস্থা করে' নেওয়াতে আপত্তি করেননি কেউ। সুবাসিনীর মা বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মেয়ের খোঁজ খবর নিতেন। তাঁরাও বহুদিন গতাসু হয়েছেন, সুতরাং সুবাসিনী প্রায় নির্ঝঞ্ঝাটেই কোলকাতায় এক গলিতে বাসা ভাড়া করে' এই কুড়ি বছর কাটিয়েছে। তার দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথম মেয়েটিকে শিক্ষা দেওয়া,

দ্বিতীয় বিজয় মল্লিককেও শিক্ষা দেওয়া। বিজয় মল্লিককে সে ভোলেনি। বিজয় মল্লিক তাকে যে অপমান করেছিলেন তা-ও সে ভোলেনি। এই কুড়ি বছর ধরে' সে ক্রমাগত ভেবেছে : কি করে' এই দ্বিতীয় লক্ষ্যটি সে ভেদ করতে পারবে। বিজয় মল্লিক একদিন তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কি করে' সে অপমানের শোধ তুলবে? বিজয় মল্লিক যেন সকাতরে কর-জোড়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—এই কাল্পনিক ছবিটাই সে মনের মণিকোঠায় টাঙিয়ে রেখেছিল। এই একটি ছবিই ছিল সেখানে, এতদিন ধরে এইটেতেই সে নানারকম রং ফলিয়েছে অহরহ। কিন্তু এই কল্পনা-বিলাস কি করে' বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে তা এতদিন ভেবে পায়নি সে। মধ্যবিত্ত অসহায় বিধবা কি ক'রে জব্দ করবে অমন প্রতাপশালী জমিদারকে! যে একদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল তার কাছে যাবেই বা কি ক'রে। তাই সে এতদিন কল্পনাতেই বিজয় মল্লিককে পদানত ক'রে সুখী ছিল। হঠাৎ কিন্তু অদ্ভুত যোগাযোগ হ'য়ে গেল একটা অপ্রত্যাশিতভাবে। হঠাৎ চাকাটা ঘুরে গেল, যা অসম্ভব মনে হচ্ছিল তা সম্ভাবের সীমায় চ'লে এল। সুবাসিনীর মেয়ে শুচিতা কলেজে বি. এ পড়ছিল। সে হঠাৎ একদিন এসে বললে—"মা, এক ভদ্রলোককে রাত্রে আজ খেতে বলেছি। ভালো কিছু রান্না কর!"

"কাকে আবার খেতে বললি?"

সুচিতা হেসে বললে, "আমাদের কলেজের লেক্‌চারার একজন। খুব ভালো পড়ান। আজ তাঁর জন্মদিন। কলেজের ছেলে মেয়েরা তাঁকে চাঁদা করে' কত কি কিনে দিয়েছে আজ। আমি তাঁকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করেছি, মানে করতে বাধ্য হয়েছি।"

সুবাসিনী প্রথমটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন মনে মনে, "বাধ্য হয়েছি মানে?"

"আমরা তাঁকে একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছি। একটা গ্রুপ ফোটো তুলে তিনি বললেন—সিংগল ছবি কার প্রথমে তুলব বল! লটারি করা হল। আমার উঠল। তিনি আমার ফোটো তুললেন। আমার যা লজ্জা করছিল! তারপর কলেজ থেকে বেরিয়ে তাঁর সংগে আবার দেখা হ'ল রাস্তায়। কথায়

কথায় তিনি বললেন, "আজ আমার মাকে মনে পড়ছে। জন্মদিনে তিনি আমাকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতেন। কতদিন হ'ল তিনি মারা গেছেন, কিন্তু ঠিক এই দিনটিতে তাঁকে এত মনে পড়ে।" তখন তাঁকে বললাম— "আপনি আজ আমাদের বাড়িতে এসে আমার মায়ের হাতের রান্না খাবেন? আসুন না। মা খুব খুশী হবেন। ও কথা শোনার পর নিমন্ত্রণ না করাটা কি ভালো দেখায়?" তখনও সুবাসিনী জানে না, যে এই লেক্‌চারারই বিজয় মল্লিকের একমাত্র পুত্র অজয় মল্লিক। ক্রমশ সবই জানা গেল। শুধু তাই নয়, ক্রমশ এই পরিচয় ঘনিষ্ট থেকে ঘনিষ্টতর হ'তে হ'তে এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছুল, যে স্তরের মহিমা সর্ব্বদেশের কাব্যকলার বিষয় বস্তু হ'য়ে মানব সভ্যতাকে অলঙ্কৃত করছে। অর্থাৎ শুচিতা ও অজয় পরস্পরে প্রেমে পড়ল। সুবাসিনীও এইবার যেন সুযোগ পেলেন। তাঁর মনে হ'ল বিজয় মল্লিককে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পাওয়ার একটা রাস্তা হ'ল এইবার বোধ হয়। অর্থাৎ যে বিজয় মল্লিক একেবারে নাগালের বাইরে ছিলেন তিনি হঠাৎ যেন খুব কাছে এসে পড়লেন। তবু কিন্তু ব্যাপারটা আবছা-অস্পষ্ট হয়েই রইল কিছুদিন। বিজয় মল্লিকের ছেলের সংগে তাঁর মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেলেই বা তাঁর প্রতিশোধ-কামনা চরিতার্থ হবে কেমন করে? তার কল্পনার ছবিতে বিজয় মল্লিক তার কাছে হাত জোড় করে' দাঁড়িয়ে আছে, যদি নির্বিঘ্নে বিয়েটা হয়েই যায় বিজয় মল্লিক তার কাছে হাত জোড করে' দাঁডাতে যাবে কোন দুঃখে? সে ছেলের বাপ, বাঙালী সমাজে তারই তো উচ্চাসন। সুবাসিনীরই তো সেখানে জোড হাতে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা। কিন্তু হঠাৎ সূত্রটাই ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হ'ল। অজয় নাকি শুচিতাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে তার বাবাকে চিঠি লিখেছিল। বিজয় মল্লিক যা উত্তর দিয়েছেন তা সাংঘাতিক। অজয় সুবাসিনীকে দেখিয়েছিল সে চিঠি। বিজয় মল্লিক লিখেছিলেন— "তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, চাকরিও করছ। স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করবার মতো সামর্থ্য তোমার হয়েছে। তবু তুমি বিবাহ বিষয়ে আমার পরামর্শ ও অনুমতি চেয়েছ এতে খুব আনন্দিত হয়েছি, কারণ এতে সুপুত্র-সুলভ শিষ্টাচার প্রকাশ পেয়েছে। আমি যা লিখছি তা হয়তো তোমার

মনোমত হবে না। তবু আমার মত যখন চেয়েছ, তখন আমার মতই তোমাকে জানাতে হবে, তোমার মন-রাখা কথা বললে ভণ্ডামি হবে সেটা। আমার মতে বিবাহ ব্যাপারটা একটা সামাজিক ব্যাপার এবং 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' প্রাচীন এই উক্তিটি মূল্যবান উক্তি। যে পুত্র বংশের মর্য্যাদা এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হবে, সে পুত্রের জননীকে যেখান সেখান থেকে কুড়িয়ে আনা চলে না। অপরিণত-বুদ্ধি যুবকদের হাতেও সে নির্ব্বাচন ভার অর্পণ করাও খুব সুবুদ্ধির কাজ নয়। কারণ যুবকরা যে কোনও যুবতী মেয়েকে দেখেই সাধারণত মুগ্ধ হয়। তাই ঠিক করেছি আমার পুত্রবধূ আমি নিজে নির্ব্বাচন করব তার কুল, কুষ্ঠি, বংশ, মর্য্যাদা, রূপ, স্বাস্থ্য সব দেখে। যে ঠাকুরঘরের পূজার আসনে তোমার মা ঠাকুমা বসে পুজো করে' গেছেন সে ঠাকুর ঘরে যাকে তাকে আমি ঢুকতে দেব না। তবে আর একটা কথাও তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছি। যদি কোনও মেয়েকে তোমার ভালো লেগে থাকে, থাকো না তাকে নিয়ে দিনকতক, তার জন্যে যদি কিছু খরচ করতে চাও কর, তাতে আমি আপত্তি করব না। তোমার বাল্যে এবং কৈশোরে তোমাকে অনেক রকম খেলনা কিনে দিয়েছি, যৌবনেও কিনে দিতে আপত্তি নেই। আপত্তি করব যদি খেলনাটাকে বিয়ে করতে চাও। আমি নিজেও নানারকম নারীর সম্পর্কে এসেছি জীবনে তা তোমার অবিদিত নেই, কিন্তু তাদের বিয়ে করে' গৃহিনী করবার প্রবৃত্তি আমার কখনও হয়নি। বিলাস-সঙ্গিনীরা গৃহস্থালির বাইরেই মানানসই, তাদের গৃহলক্ষ্মী করবার চেষ্টা করা হাস্যকর এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল। আমার এই সেকেলে মতামত হয়তো তোমাদের কাছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা ভালগার বলে' মনে হবে, তা হোক, বাকী জীবনটা ওই কুসংস্কারকেই আঁকড়ে থাকব আমি। তুমি তো জানই নানারকম কুসংস্কার আছে আমার। পাঁজি মানি, কুষ্ঠি মানি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ভার্গব মল্লিক সেকালে কোলকাতা থেকে কাঁঠাল কাঠের যে প্রকাণ্ড সিন্দুকটা কিনে এনেছিলেন এবং যার ভিতর রহস্যময়ভাবে একটি পিতলের লক্ষ্মিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল সেই লক্ষ্মিমূর্ত্তিটিকে আমি আমাদের বংশের উন্নতির কারণ বলে মানি এবং তাই আজও সেই সিন্দুকবাহিনী লক্ষ্মির পুজো সাড়ম্বরে

করি। অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, লক্ষ্মিকে সিন্দুক থেকে বার করে' ঠাকুর ঘরে স্থাপন করতে। কিন্তু আমার পিতা পিতামহ যা করেন নি আমিও তা করতে সাহস পাইনি। আমার এসব কুসংস্কারের কথা তুমি জানো, এসব জেনেও তুমি এতকাল আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে' এসেছ। বিবাহ প্রসঙ্গে আমার মতামত তোমাকে জানালাম, আশা করি এটাও তুমি বরদাস্ত করতে পারবে।"

চিঠিটা বজ্রাঘাতের মতো এসে পড়ল ওদের স্বপ্ন-সৌধ-শীর্ষে। ওদের মানে শুচিতা অজয়ের। সুবাসিনীর মনে এ চিঠির প্রতিক্রিয়া কিন্তু হ'ল অন্য রকম। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল যেমন করে' হোক এ-বিয়ে ঘটাতেই হবে। যে বিজয় মল্লিক তাকে অপমান করে' তাড়িয়ে দিয়েছিল, তার ঘরেই মেয়েকে সর্ব্বেসর্ব্বা করে' তবে সে ছাড়বে। বিজয় মল্লিকের চিঠি পেয়ে তাই অজয়-শুচিতা যদিও খুব মনমরা হয়ে পড়েছিল—শুচিতা নিজের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত, অজয়ের মুখের হাসি নিবে গিয়েছিল—কিন্তু সুবাসিনী দমল না। ভেবে চিন্তে একটা উপায় আবিষ্কার করে' ফেলল সে। প্রথমেই সে ঠিক করল তার পূর্ব্ব-পরিচয় লোপ ক'রে দিতে হবে। কোলকাতায় যে পাড়ায় সে থাকত সে পাড়ায় তার সুবাসিনী নামটা কেউ জানত না। শুচুর মা বলেই তাকে ডাকত সবাই। পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল থেকে অনেকদিন আগেই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিল সে। তবু যে দুই একজন আত্মীয়স্বজন ছিল, তাদের কাছে সে কল্পিত এক লোকের স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলে যে সুবাসিনী আর তার মেয়ে কলেরায় হঠাৎ মারা গেছে। মুমূর্ষু সুবাসিনীর কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে স্বাক্ষরকারী তাকে যেন এই সংবাদটা জানাচ্ছে। আর একটা কাজও করল সুবাসিনী। অনেক আগেই আর একটা খবর জানত সে। তার প্রতিবেশী চতুর বাবু (পুরোনাম চতুর্ম্মুখ সিংহ) স-পরিবারে বিজয় মল্লিকের কুলগুরু মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নিয়েছেন। চতুর বাবুর বাড়িতে আসা যাওয়া ছিল সুবাসিনীর। সুবাসিনী একদা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, তিনিও মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নিতে চান। চতুরবাবুর সহায়তায় এ ইচ্ছা অপূর্ণ রইল না। মাধবানন্দের কাছে মন্ত্র নেওয়ার একদিন পরেই সুবাসিনী তাঁকে

বললেন, "গুরুদেব, সংসারে একটি মাত্র বন্ধন আমার ওই মেয়ে। তার যদি বিয়েটা হ'য়ে যায় তাহলে আমি নিশ্চিন্তমনে আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারি। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে বিয়েটা হয়ে যায়—"

মাধবানন্দ লোক খারাপ নন। বললেন, "আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য হয় ততটুকু আমি নিশ্চয় করব!"

"পুরন্দরপুরের বিজয় মল্লিক শুনেছি আপনার শিষ্য। তাঁর একটি চমৎকার ছেলে আছে। আপনি যদি একখানা চিঠি লিখে দেন—"

"চিঠি লিখে দিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু এসব ব্যাপারে কেবল চিঠি লিখে কাজ হয় না। যেতে হবে সেখানে।"

সুবাসিনী চুপ ক'রে রইলেন ক্ষণকাল।

"আমার তো পুরুষ অভিভাবক নেই। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমিই যাব। ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে আর আপত্তি কি। তবে আপনি দয়া করে' একখানা চিঠি দিয়ে দেবেন।"

"তা দোব"—

মাধবানন্দের কাছ থেকে চিঠিখানি সংগ্রহ ক'রে সে রাখল বটে কিন্তু কল্পনায় আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হল সে। বিজয় মল্লিক নিশ্চয় মেয়েটির বংশ-পরিচয় জানতে চাইবেন। শুচিতাকে দেখে তাঁর পছন্দ হবেই, একটা মিথ্যা কুষ্ঠি তৈরী করানোও অসম্ভব হবে না, কিন্তু বংশ পরিচয়? এযুগে টাকা দিয়ে প্রতিপত্তি, যশ, সতীত্ব সবই কেনা যায়, বংশ-পরিচয়ও নিশ্চয় কেনা যায়, কিন্তু বিক্রেতা কোথায়! সুবাসিনী চোখ কান খুলে রাখল চারিদিকে।

অজয় আর শুচিতা অবশ্য আধুনিক যুগোপযোগী নানা উপায় আবিস্কার করতে ব্যাপৃত হয়েছিল। অজয় আরও গোটা দুই টিউশনি জোগাড় করে নিজের আয় বাড়িয়েছিল। শুচিতা ঠিক করেছিল বি, এ পাশ করে' বি, টি পড়বে। দুজনে উপার্জন করলে সংসার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াবার আগে তারা বিয়ে করবে না। যুক্তির পথ অনুসরণ করে' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে বাধ্য হয়েছিল যদিও, কিন্তু উপনীত হয়ে সুখ

পাচ্ছিল না। অজয় শুচিতাকে বলেছিল—"বাবার পয়সায় যে ষ্টাইলে এতকাল থেকে এসেছি, ঠিক সেই ষ্টাইলে থাকবার মতো পয়সা রোজকার করতে অবশ্য অনেক দেরী হবে, হয়তো পারবই না, কিন্তু মাসে অন্তত শ' পাঁচেক টাকার সংস্থান না হলে বিয়ে করা উচিত নয়। এখন আমাদের আয় শ' তিনেক টাকা মাত্র—"

শুচিতা হেসে উত্তর দিয়েছিল—"বাকী দু'শ টাকা আমি নিশ্চয়ই রোজকার করতে পারব। পারব না ?"

"সন্দেহ আছে। টিচারদের মাইনে যে খুব কম—"

"আমি গানেরও ট্যুশনি করতে পারব—। পারব না ?"

"আমারও চাকরির আরও উন্নতি হ'তে পারে।"

এই ধরণের আকাশ-কুসুম রচনা করছিল তারা। শুচিতা গান-বাজনা ভালো ভাবেই শিখেছিল। গান শিখিয়ে কিছু রোজগার সে এখনই করতে পারে, অজয়ের তাতে কিন্তু যেমন মত নেই। সে বলত, "আমাদের দেশের পুরুষেরা এখনও তেমন ভদ্র হয় নি।" শুচিতার মতো রূপসী যদি বাড়ী বাড়ী গিয়ে গান শেখায়, অঘটন ঘটে যাবার সম্ভাবনা। শুচিতাকে অবশ্য কলেজের নানা ফাংসানে—সভা সমিতি—চ্যারিটি শো'তে গান গাইতে হ'ত। নেচেওছে সে মাঝে মাঝে। নাচও সে ভাল শিখেছিল। এমনি এক চ্যারিটি শো'য়ে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে সুবাসিনীর সংগে বিশ্বপতির দেখা হ'য়ে গেল। তার মনে হল কলেজের কোনও ছাত্র বা ছাত্রী নিশ্চয় বিশ্বপতির কাছে টিকিট বিক্রি করেছে, আর সে তো নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিল। বিশ্বপতি সুবাসিনীকে চিনতে পারেনি, ভীড়ের মধ্যে লক্ষ্যই করেনি বোধ হয়। সুবাসিনী কিন্তু করেছিল এবং প্রথমটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল খুব। কিন্তু শো দেখতে দেখতে তার মাথায় অন্য ধরণের চিন্তা আবির্ভূত হল ক্রমশঃ। যে বিশ্বপতি একদিন টাকার লোভে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিজয় মল্লিকের হাতে তুলে দিয়েছিল, তার সংগে এখন বিজয় মল্লিকের সম্পর্কটা কি রকম! এখনও তার সংগে বিজয় মল্লিকের বন্ধুত্বটা অক্ষুণ্ণ আছে কি ? এই সব চিন্তা তার মাথায় খেলতে লাগল। এমন সময় একটা ইণ্টারভ্যালে—

অজয় এসে বললে—"চলুন, একটু চা কিম্বা সরবৎ খাওয়া যাক। গ্রীণ রুমে চলুন—"

চা কিম্বা সরবৎ খাওয়ার তত ইচ্ছে ছিল না তার। বিশ্বপতির খবর নেওয়ার জন্যই সে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। তার মনে হ'ল অজয় হয়তো বিশ্বপতির খবর জানতে পারে। বিশ্বপতি বিজয় মল্লিকের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিল, বিজয় মল্লিকের বাড়িতে যাতায়াতও ছিল তার এককালে, অজয় হয়তো কিছু খবর দিতে পারবে।

একটু আড়াল পেয়ে সুবাসিনী জিগ্যেস করলে—"বিশ্বপতিবাবু এসেছেন দেখছি। চেন তুমি ওঁকে—"

"খুব চিনি, বাবার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এককালে। আমিই তো ওঁকে কম্‌প্লিমেণ্টারি কার্ড পাঠিয়েছিলাম একটা। আজকাল বড় কষ্টে আছেন বিশুকাকা—। আপনি চেনেন নাকি ?"

"আমার দূর সম্পর্কের ভাই হন উনি। অনেকদিন দেখা শোনা নেই। এখানে কোথা থাকেন ?"

"সুকিয়া ষ্ট্রীটে। বড কষ্টে আছেন। বাবাই তো ওঁকে বরাবর টাকা কড়ি দিতেন, হঠাৎ বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে গেছে—বাবা রগচটা মানুষ তো—।"

"কি করেন উনি আজকাল ?"

"কিসের যেন দালালি করেন। বিশেষ কিছু হয় না। আমি মাঝে মাঝে কিছু কিছু করে দিই !—"

"ছেলে মেয়ে আছে—?"

"না, সংসার বড় নয়, সেইটেই বাঁচোয়া। স্ত্রী একটি মেয়ে রেখে অনেকদিন আগে মারা গেছেন। মেয়েটি তাঁর মাসীর কাছে মানুষ হচ্ছিল। সে-ও মারা গেছে শুনছি—"

সুবাসিনী একথা শুনে যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেল। এই দুঃসংবাদটাই যেন সুসংবাদ বলে' মনে হল তাঁর কাছে। অজয়ের কাছে তার ঠিকানাটা নিয়ে নিলেন। ঠিক করলেন তার সঙ্গে গিয়ে দেখাই করবেন

একদিন। তাকে যদি নিজের দলে টানতে পারেন তাহলে বিজয় মল্লিকের কাছে কথাটা অনায়াসে পাড়া যাবে। আর একটা সুবিধা—বিশ্বপতিবাবুও বিজয় মল্লিকের ঠিক পালটি ঘর। তিনি যদি শুচিতাকে নিজের মেয়ে বলে' পরিচয় দিতে রাজি হন তাহলে বংশ-পরিচয়ের হাঙ্গামাটা মিটে যায়।

সুবাসিনী আর বিলম্ব করল না। পরদিন সকালেই কালীঘাট যাবার নাম করে' বেরিয়ে পড়ল সে বাড়ি থেকে এবং খুঁজে খুঁজে বিশ্বপতির ঠিকানায় গিয়ে হাজির হ'ল। দেখল একটা তিনতলা বাড়ির নীচের একটি ঘরে তিনি থাকেন। কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন। সুবাসিনী এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

"আমাকে চিনতে পারেন দাদা—"

বিশ্বপতির চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল, তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন সুবাসিনীর মুখের দিকে।

"না, ঠিক চিনতে পারছি না তো?"

"আমি সুবাসিনী—"

"ও?"

বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বপতি। হঠাৎ সমস্ত মনে পড়ে গেল। টাকার লোভে একদা তিনি সুবাসিনীর কত বড় সর্ব্বনাশ করেছিলেন তার পুরো ইতিহাসটা যেন বিদ্যুতের অক্ষরে জাজ্বল্যমান হ'য়ে উঠল তাঁর চোখের সামনে। নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সুবাসিনীও দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। তারপর প্রথমে সুবাসিনীই কথা কইল, "চলুন, ভিতরে চলুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে একটু।"

"এস এস!"

ভিতরে গিয়ে বিছানা পত্রের অবস্থা দেখে সুবাসিনীর বুঝতে দেরি হল না যে, বিশ্বপতির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। নিজেই সে কথা ব্যক্ত করলেন তিনি।

"এই একখানি মাত্র ঘর নিয়ে কোন রকমে আছি। অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। বস ওই খাটেই বস! আমি এই মোড়াটায় বসছি।"

একটা জীর্ণ মোড়া ঘরের কোণ থেকে নিয়ে বসলেন তিনি। সুবাসিনী প্রশ্ন করল, "এমন দুরবস্থা কেন হ'ল আপনার?"

"ভগবান বলে' একজন আছেন তো! জীবনে অনেক পাপ করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করছি। তারপর তুমি কি মনে করে'—"

"আপনার সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি। আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে আমার কন্যাদায় উদ্ধার হয়।"

"কি রকম, আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি তোমাকে? আমি নিজেই তো সহায় সম্বলহীন।"

"বিজয়বাবুর সঙ্গে এখন আপনার সম্পর্কটা কি রকম?"

"খুব খারাপ। সম্পর্ক নেই বললেই চলে। অনেককাল দেখা শোনা নেই, আগে দু'একটা চিঠিপত্র লিখতাম, আজ কাল তাও আর লিখি না।"

"অত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আপনারা, হঠাৎ এরকম হ'ল কেন?"

"আর খোশামোদ করতে পারলাম না। ওর খেয়াল মেটাবার জন্যে অনেক কুকাজ করেছি জীবনে। শেষটা আর পারলাম না। একথা জানতে চাইছ কেন, তার কাছে আবার ফিরে যাবার মতলব না কি। তোমার স্বামী তো মারা গেছেন শুনেছি—"

"ফিরে যাবারই মতলব আছে, কিন্তু ভিন্ন পথে। আমার মেয়ে শুচিতার সঙ্গে তার ছেলে অজয়ের বিয়ে দিতে চাই। আমার পদস্খলন হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে পদস্খলনের প্রভাব আমার মেয়ের মনে বা দেহে নেই। আমার দুর্মতি হবার আগেই যে ওর জন্ম হয়েছিল তা আপনি জানেন, আমার কলঙ্ক আমারই, আমার মেয়ের নয়, তাই ইচ্ছে করেই ওর নাম রেখেছি শুচিতা। অজয় যে কলেজে পড়ায়, সেই কলেজেই শুচিতাও পড়ে। দু'জনের ভাব হয়েছে খুব। অজয় তার বাবাকে চিঠি লিখেছিল বিয়ের প্রস্তাব করে, তার উত্তর তিনি এই দিয়েছেন - "

অজয়ের চিঠিখানি সুবাসিনী অজয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে' রেখেছিল, আসবার সময় সঙ্গেও এনেছিল। বিশ্বপতি চিঠিখানি পড়ে' বললেন—"এ চিঠির পর আর কথা কওয়া শক্ত। তোমার মেয়ে দেখতে কেমন—?"

"কাল চ্যারিটি শো'য়ে যে কথ্‌থক্‌ নাচছিল, সেই আমার মেয়ে।"

"ও! সে তো রূপসী—"

"বি, এ, পড়ছে। পড়াশোনায় খুব ভালো—"

"আটকাবে কিন্তু বংশ-পরিচয়ে—"

"শুচিতার বংশ-পরিচয়ে কোন দোষ নেই। সে সদ্বংশের মেয়ে, তার বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল।"

"কিন্তু তার মায়ের পরিচয় ঢাকবে কি করে! বিজয়ের কাছে অন্তত সেটা লুকোনো যাবে না?"

"যাবে, যদি আপনি সাহায্য করেন! আমি যে শুচিতার মা একথা বিজয়বাবুর কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে। আপনার একটি মেয়ে আপনার শালীর কাছে মানুষ হচ্ছিল, সে মারা গেছে শুনেছি। বিজয়বাবুও কি শুনেছেন একথা?"

"না, সে শোনে নি, তার সঙ্গে অনেককাল চিঠিপত্র বন্ধ হয়েছে—"

"আপনি শুচিতাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিন তাহলে। আমি হই তার মাসী। বিজয়বাবুর কুলগুরুর কাছে আমিও মন্ত্র নিয়েছি! তিনি বিজয়বাবুর নামে একটা চিঠিও দিয়েছেন। আপনি যেন নিজের মেয়ের সঙ্গে অজয়ের সম্বন্ধ করছেন এই ভাবে একটা চিঠি লিখুন। আপনি ওঁর বন্ধু, আপনি ঠিক পালটি ঘরও, কিছু বেমানান হবে না—"

"আমি তা পারব না। এতক্ষণ বলিনি, সে অপমান করে' তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে একদিন। তার দ্বারস্থ হ'তে আর পারব না।"

"তাহলে আমি নিজেই যাব গুরুদেবের চিঠি নিয়ে। ঘোমটা দিয়ে থাকব, আমাকে তিনি চিনতে পারবেন না। কিন্তু আপনার মেয়ে বলে' শুচিতার পরিচয় দেব। তাতে আপত্তি আছে কি আপনার?"

বিশ্বপতি চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর ইতস্তত ভাব দেখে সুবাসিনী বলল, "একটি কথা শুধু মনে করিয়ে দিতে চাইছি আপনাকে। আমার যে কলঙ্ক আজ আমার নিষ্পাপ মেয়ের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে' তুলেছে, তার জন্মে আমিই দায়ী, আমার দোষ আমি ঢাকতে চাইছি না। আমি বিজয়কে সত্যিই ভালবেসেছিলাম, কিন্তু আপনি যদি যোগাযোগ না ঘটাতেন, তাহলে হয়ত বাড়ী থেকে আমি বেরিয়ে যেতাম না। এতে যদি পাপ হয়ে থাকে, আপনারও পাপ কম হয় নি। আমি আজ আপনাকে যা করতে বলছি তা কিন্তু পুণ্য কর্ম্ম। অজয়ের সঙ্গে শুচিতার যদি বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেটা ন্যায় বিচারই হবে। ভেবে দেখুন ভাল করে'—অমত করবেন না।"

বিশ্বপতি বললেন, "বেশ! কিন্তু আমি তাকে চিঠি লিখতে পারব না, যেতেও পারব না। বিজয় যদি আমাকে চিঠি লেখে তাহলে তাকে আমি জানিয়ে দেব যে শুচিতা আমারই মেয়ে। কিন্তু শুচিতা অজয় কি এই মিথ্যাটাকে মেনে নেবে!"

"তাদের এখন জানাবই না। তারপর যদি জানতে পারে তখন সব খুলে বললেই হবে। সব শোনবার পর আমার মনে হয় ওরা আপত্তি করবে না। আমি তাহলে চেষ্টা করে' দেখি—?"

"দেখ। কিন্তু আমার মনে হয় হবে না।"

বিশ্বপতির বাসা থেকে বেরিয়ে সুবাসিনী আবার গুরুদেবের কাছে গেল। তাঁকে গিয়ে বলল—"চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে শুচিতা আমারই মেয়ে, কিন্তু আসলে ও আমার বোনের মেয়ে, আমার বোন মারা গেছে অনেক দিন আগে, আমিই ওকে মানুষ করেছি। সেই কথাটাই লিখে দিন খুলে।"

মাধবানন্দ তাই লিখে দিলেন।

সুবাসিনী পুরন্দরপুরে যখন পৌঁছল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। বিজয় মল্লিকের প্রকাণ্ড বাড়িটা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। সিংহদরজা দিয়ে আধ-ঘোমটা টেনে সে যখন ভিতরের দিকে অগ্রসর হ'ল

তখন বিশেষ কেউ বাধা দিল না। গেটে দারোয়ান ছিল, দু'একটা চাকর-বাকরও আনাগোনা করছিল, কিন্তু মেয়েমানুষ বলেই সম্ভবত কেউ তাকে বিশেষ কিছু বলল না। আলোকিত বৈঠকখানার সামনে এসে অবশেষে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাকে। বারান্দায় দু'চার জন লোক ছিল, ঘরের ভিতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

সুবাসিনী ঘোমটা আর একটু টেনে এগিয়ে গেল এবং মৃদুস্বরে একজনকে ডেকে বলল, "আমি কোলকাতা থেকে এসেছি। বিজয়বাবুর নামে একটা চিঠি আছে।"

লোকটি বিজয়বাবুর গোমস্তা একজন।

"আসুন, এইখানে বসুন। চিঠিটা দিন আমাকে—বাবু বাইরেই আছেন।"

বারান্দার উপর যে বেঞ্চটি ছিল তারই একধারে বসল সে। বসেই শুনতে পেল—"সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার দারোগা বাবু! চোরে যদি আমার সর্বস্ব চুরি করে' নিয়ে যেত তাহলেও আমি গ্রাহ্য করতাম না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের ওই সিন্ধুক—যে সিন্ধুক আমার প্রপিতামহ ভার্গব মল্লিক নৌকা করে' কোলকাতা থেকে এনেছিলেন, যার ভিতর লক্ষ্মির মূর্ত্তি রহস্যময়ভাবে পাওয়া গিয়েছিল এবং যে সিন্ধুক আসবার পর থেকে আমাদের সংসারের সর্বপ্রকার উন্নতি হয়েছে—সেই সিন্ধুকটাকে ওরা চেলিয়ে টুকরো টুকরো করে' দিলে। লক্ষ্মির মূর্ত্তিটা পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না—উঃ, এর একটা বিহিত করুন দারোগাবাবু, লক্ষ্মির মূর্ত্তিটা আমার চাই—"

যদিও অনেকদিন পরে শুনল তবু বিজয় মল্লিকের কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হল না সুবাসিনীর। অজয়ের চিঠিতে এই সিন্ধুকের কথাও সে পড়েছিল। যিনি উত্তর দিলেন তিনিই সম্ভবত দারোগাবাবু। "আমার লোকজনেরা তো খুঁজেছে অনেক, এখনও খুঁজছে। কিন্তু ও মূর্ত্তি আর পাওয়া যাবে বলে' মনে হয় না। ওটা পিতলেরই ছিল কি?"

"আমরা তো পিতলের বলেই জানতাম। কিন্তু সত্যি কিসের ছিল তা কি করে' বলব বলুন। আমার প্রপিতামহ তো ওটা বাজার থেকে কেনেন নি,

তিনি কিনেছিলেন সিন্ধুকটা। বাড়ীতে সিন্ধুক যখন খোলা হল তখন দেখা গেল তার মধ্যে ওই মূর্ত্তি রয়েছে। তখন আমাদের যিনি কুলগুরু ছিলেন, তিনি বললেন—সিন্ধুক থেকে ওঁকে বার কোরো না কখনও। নারিকেল ফলোম্বুবৎ উনি এসেছেন, ওই ভাবেই থাকুন, ওই বন্ধ সিন্ধুকের সামনেই পুজো কর তোমরা। তাই হয়ে এসেছে এতকাল, আমাদের উন্নতিও হয়েছে,—কিন্তু কাল একি কাণ্ড হল বলুন তো। মনে হচ্ছে আমার মেরুদণ্ডটাই যেন ভেঙে গেছে—"

দারোগাবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"কি আর করবেন বলুন। আমি আর একবার চেষ্টা করে' দেখি যদি কোনও পাত্তা লাগাতে পারি—"

"দেখুন, দেখুন প্লীজ—"

এরপর দারোগাবাবু বেরিয়ে এলেন এবং চলে গেলেন।

গোমস্তাটি চিঠি নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

"মেয়ে মানুষ? কি চিঠি এনেছে দেখি—"

বিজয় মল্লিকের গলা আবার শোনা গেল।

চিঠিটা পড়ে তিনি বললেন—"গুরুদেবের কাছ থেকে এসেছেন? আচ্ছা, ওকে ভিতরে পিসিমার কাছে নিয়ে যাও। আমি পরে ওঁর সঙ্গে কথা বলব।"

বিজয় মল্লিকের অন্তঃপুরে গৃহকর্ত্রী ছিলেন এক স্থবিরা পিসীমা। তিনি সুবাসিনীর আগমনের হেতু শুনে পুলকিত হ'য়ে উঠলেন। অজয়ের বিবাহের জন্য তিনি বহুকাল থেকে উৎসুক হ'যে আছেন। কত সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু বিজয় মল্লিক কাউকে পছন্দ করেন নি। প্রত্যেকেরই একটা না একটা খুঁত বেরিয়ে পড়েছে। সেই সবেরই বিবরণ বলতে লাগলেন তিনি সুবাসিনীকে। শেষে বললেন, "তোমার মেয়ে যখন সুন্দরী, আর ওর বন্ধুর মেয়ে, গুরুদেবও পছন্দ করেছেন বলছ, তখন হয়তো হয়ে যেতে পারে—"

কিন্তু হল না। সেইদিন বিজয় মল্লিক স্পষ্ট ভাষায় বলে' দিলেন "বিশ্বপতির মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, মাপ করবেন আমাকে।"

পরদিন ভোরের ট্রেনেই বিফলমনোরথ হ'য়ে ফিরে আসতে হল সুবাসিনীকে।

সুবাসিনী অজয় আর শুচিতাকে বলেই গিয়েছিল যে সে গুরুদেবের চিঠি নিয়ে পুরন্দরপুরে যাচ্ছে তাদের বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে। সে যখন হৃদয় বিদারক দুঃসংবাদটা নিয়ে ফিরে এল, তখন শুচিতার চোখে মুখে একটা সপ্রতিভ হাসি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল যদিও, কিন্তু সুবাসিনীর কাছে সে হাসির মেকিত্ব ধরা পড়ল অবিলম্বে। তার অন্তর্দৃষ্টির কাছে কিছুই লুকোনো রইল না। সে নিজেই যে একদিন প্রেমে পড়েছিল, শুচিতার হাসির অর্থ বুঝতে একটুও দেরি হল না তার। সুবাসিনী যখন ফিরল তখন অজয় ছিল না। সে এল সন্ধ্যার পর। সে আসতেই শুচিতা হেসে বলল—"মা ফিরে এসেছেন। একেবারে কলকে পাননি সেখানে।"

সুবাসিনী হাসি মুখে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "আমি একটা খারাপ সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম। তোমাদের বাড়ির সেই লক্ষ্মীর সিন্ধুক চুরি গেছে। তোমার বাবা অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাঁর মনের ভাব দেখে মনে হল আমি যদি তাঁর হারানো লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিতে পারি তাহলে হয়তো উনি আমার প্রস্তাবে রাজি হলেও হতে পারেন। লক্ষ্মীর জন্যে উনি পাগল হয়ে উঠেছেন—'

"তাই না কি! আমি তো কোনও খবর পাইনি।"

তার পরদিন সকালেই কিন্তু অজয় এসে হাজির হল আবার।

"বাবা জগন্নাথ গোমস্তার হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন অবিলম্বে তেমনি একটা সিন্ধুক আর তেমনি একটা পেতলের লক্ষ্মী কিনে পাঠাতে। অত বড় সিন্ধুক চট করে পাওয়া গেল না। জগন্নাথের হাতে চিঠি লিখে পাঠালাম যে আমি যতশীঘ্র সম্ভব সিন্ধুক আর লক্ষ্মী পাঠাচ্ছি। আপনি কাল বলছিলেন তাঁর হারানো লক্ষ্মী ফিরিয়ে দিলে তিনি হয়তো রাজি হবেন। এই শুনে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আপনি যদি রাজি হ'ন আর শুচিতা যদি ভাল

করে’ অভিনয় করতে পারে তাহলে কি হয় বলা যায় না। তবে ব্যাপারটা একটু রিস্‌কি—”

“কি বলই না শুনি—”

সুবাসিনী শুচিতা দুজনেই উদগ্রীব হয়ে উঠল। অজয় মৃদু হেসে চুপ করে’ রইল কিছুক্ষণ।

সুবাসিনী বলল—“শুনিই না তোমার প্ল্যানটা। অসম্মানকর যদি না হয় আপত্তি করব কেন—”

অজয় হেসে বললে—“ঠিকমতো অভিনয় করতে পারলে বাবার কুসংস্কারের রন্ধ্র দিয়ে শুচিতা আমাদের বাড়িতে হয়তো ঢুকতে পারে।”

“কি করতে হবে”—শুচিতা হেসে জিজ্ঞাসা করলে।

“আমাদের যে সিন্ধুক চুরি গেছে তা প্রকাণ্ড সিন্ধুক। প্যাসেঞ্জার ট্রেণে তা পাঠানো যাবে না। মাল গাড়িতে যেতে পারে, কিন্তু তাতে অনেক দেরী হবে। বাবা লিখেছেন আগামী বৃহস্পতিবারের আগেই সিন্ধুক আর পিতলের লক্ষ্মী পুরন্দরপুরে পৌঁছন চাই। একমাত্র উপায় হচ্ছে লরী করে’ পাঠানো। আমার এক বন্ধু লরী ড্রাইভার আছে। পুরন্দরপুরে পৌঁছবার ঠিক আগে শুচিতাকে যদি সিন্ধুকের মধ্যে পুরে দেওয়া যায়, কেমন হয়! বাবার প্রপিতামহ ভার্গব মল্লিক সিন্ধুকের ভিতর রহস্যময় ভাবে পিতলের লক্ষ্মী পেয়েছিলেন, বাবা একেবারে জীবন্ত লক্ষ্মী পেয়ে যাবেন—”

“পাগল নাকি! দম আটকে যাবে না আমার!”

শুচিতা হেসে লুটিয়ে পড়ল।

“দম আটকাবে কেন। প্রকাণ্ড সিন্ধুক। আর কতক্ষণই বা থাকবে তার ভিতর। ডালাটা খুলেও বসে থাকতে পার। পুরন্দরপুরে ঢোকবার ঠিক আগে তালাটা বন্ধ করে দিলেই হবে। আমাদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তো বাবা সিন্ধুকের ডালাটা খুলে দেখবেন। সিন্ধুকের ভিতর হাওয়া ঢোকবার একটা ব্যবস্থা করাও অসম্ভব নয়। অনায়াসেই সেটা হ’তে পারে।” কথাটা শুনে সুবাসিনীর কল্পনা পাখা মেলে উড়তে লাগল। শুচিতা পারবে কি? যদি পারে…! শুচিতার চোখ দুটোও জ্বল-

জল করে' উঠল সকৌতুক উৎসাহে। তৎক্ষণাৎ সে ঠিক ক'রে ফেলল এই দুঃসাহসিক অভিযানে যেতেই হবে। ব্যাপারটার অভিনবত্বেই উৎসাহিত হ'য়ে উঠল সে। ঠিক বিয়ের লোভে নয়। বিয়ের সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত ছিল। সে জানত অজয়কে সে জয় করেছে, বিয়ে একদিন না একদিন হবেই। কিন্তু সিন্ধুকের ভিতর থেকে আবির্ভূত হ'য়ে এক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঢুঁদে জমিদারকে অভিভূত ক'রে ফেলার মধ্যে যে মজা আছে, সেইটে উপভোগ করবার জন্যেই সে তৎক্ষণাৎ ঠিক ক'রে ফেললে যাবে।

অজয়ের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে সে বললে—"সিন্ধুক থেকে বেরিয়ে কি বলতে হবে আমাকে ?—"

"কিছু বলতে হবে না। খুব যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেছ এইরকম ভান করতে হবে শুধু। অনেক পীড়াপীড়ি করলে বলবে—'আমি এই সিন্ধুকের মধ্যে কি ক'রে এলাম কিছু বুঝতে পারছি না। আমি আমার বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম, কিছুই জানিনা, এই ধরণের দু'চার কথা ব'লে সিন্ধুক থেকে বেরিয়ে পরের ট্রেনেই এখানে চ'লে আসবে—"

"তারপর—?" সুবাসিনী রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে।

"তারপর খুব সম্ভব বাবাও ওর পিছু পিছু আসবেন। তখন আপনিও ওই কথাই বলবেন। ওঁকে এটা বিশ্বাস করিয়ে দিতে হবে যে শুচিতা রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল কি ক'রে যে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করল তা আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনি থানায় ডায়েরিও একটা ক'রে দিতে পারেন! আচ্ছা বাবা কি আপনাকে দেখেছিলেন ?"

"না, তাঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।"

"ভালই হয়েছে! আমিও বাবাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি যে মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম তার সঙ্গে বিয়ে দিতে বাবার যখন আপত্তি আছে তখন আমি সে ইচ্ছা বর্জ্জন করলাম। এটা লেখবার উদ্দেশ্য বাবা যাতে না মনে করেন আমি এই ষড়যন্ত্র ক'রে এই কাণ্ড করেছি—"

"এত বুদ্ধিও তোমার মাথায় খেলে!"

মুচকি হেসে শুচিতা পাশের ঘরে চলে গেল।

সুবাসিনী কিন্তু ব্যাপারটার অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে আশা করছিল যে অজয় যা বললে তা ঠিক যদি অনুষ্ঠিত হয় তাহলে বিজয় মল্লিক ঠিক তার দ্বারস্থ হবে। এইটেই তো সে চায়।

"তোমার বাবা এসে পড়লে আমি কি করব ?"

"কি আবার করবেন। আদর যত্ন করবেন, আর কথায়-বার্ত্তায় জানিয়ে দেবেন যে, আপনি তাঁর পালটি ঘর। আর কিছু করতে হবে না—"

"বেশ, পারো যদি আমার আপত্তি নেই। এখন দেখ শুচিতা রাজী হয় কি না—"

তারপর সুবাসিনী হঠাৎ প্রশ্ন করল—"তোমার ড্রাইভার বন্ধু নিখিল বেশ বিশ্বাসযোগ্য লোক তো—?"

"খুব বিশ্বাসযোগ্য—"

"তাহলে দেখ যদি পারো—"

একটু পরেই আবার ফিরে এল অজয়। তার চোখ মুখ উত্তেজনায় আনন্দে উদ্ভাসিত। সুবাসিনীর সঙ্গেই প্রথমে দেখা হল তার।

"শুচিতা রাজি আছে তো" ?

"হবে না আবার। আজকালকার মেয়ে—!"

"আমি সিন্দুকটা কিনেছি, প্রকাণ্ড সিন্দুক, একটা ছোটখাটো ঘরের মতন। তার একাধারে আমি ছোট একটা শ্লাইডিং জানালাও করতে দিয়ে এলাম। আর একটা কাজও করতে হবে। এ ঠিকানাটা বদলাতে হবে আপনাদের।"

"কেন ?"

"আপনি যে গুরুদেবের চিঠি নিয়ে বাবার কাছে গিয়েছিলেন। গুরুদেব কি বাসার ঠিকানা জানেন ?"

"জানেন বোধ হয়।"

"তাহলে এ বাসায় থাকা চলবে না। আমি একটা খালি বাড়ি পেয়েছি, সেইখানেই চলুন আপনারা। কারণ, বাবা যদি আসেন গুরুদেবের কাছে যাবেনই, তিনি আপনার কথা বলবেন, তাহলেই সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে—"

"তা বটে !"

"শুচিতা কোথা ?"

"সে বেরিয়েছে শাড়ি কিনতে। সবুজ রঙের শাড়ি—"

"কেন— ?"

"লক্ষ্মির শাড়ী নাকি সবুজ রঙের। অবনী ঠাকুরের লেখায় আছে না কি ?"

"আমি তাহলে বাড়িটা ঠিক করি গিয়ে। কালই যেতে হবে সেখানে।"

সোৎসাহে বেরিয়ে গেল অজয়।

অপূর্ব্ব অভিনয় করল শুচিতা। নিখিল তালা-বন্ধ বিরাট সিন্ধুকটি নাবিয়ে বিজয় মল্লিকের হাতে চাবিটি দিয়ে চলে যাবার পরই সেই বিরাট সিন্ধুককে ধরাধরি ক'রে ঘরের ভিতরে আনা হ'ল। বিজয় মল্লিক শঙ্কিত হৃদয়ে স্বহস্তে চাবিটা খুললেন, তারপর ডালা খুলেই চমকে উঠলেন।

"একি, সিন্ধুকের ভিতর এ কে !"

শুচিতা চোখ বুজে নিঃশব্দে শুয়েছিল, যেন ঘুমুচ্ছে।

বিজয় মল্লিকের হাঁক ডাকে আরও অনেকে এসে জুটে গেল। তারপর শুচিতা উঠে বসল, দুহাতে চোখ কচলে, সবিস্ময়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "আমি কোথায় এসেছি—! এ কি—"

তারপর উঠে দাঁড়াল।

বিজয় মল্লিক স-সম্ভ্রমে স'রে গেলেন। যারা ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল তারাও পিছিয়ে গেল একটু। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ।

"আমাকে বার ক'রে দিন এই সিন্ধুক থেকে ! এর ভিতর কি ক'রে এলাম আমি ! আশ্চর্য্য ! কি করে বার হব আমি এর থেকে—"

বিজয় মল্লিক শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন নিজেই তাকে ধ'রে বার করবেন বলে', কিন্তু শুচিতা বলে উঠল—"না, না আমাকে ছোঁবেন না কেউ

আপনারা। একটা টুল বা মোড়া দিন, আমি আপনিই' বেরুতে পারব। কি আশ্চর্য্য, আমি কি ক'রে এলাম এর মধ্যে!"

দুটো টুলের সহায়তায় শুচিতা বেরিয়ে পড়ল সিন্ধুক থেকে। তারপর ঘরের কোণে যে চেয়ারটা ছিল হঠাৎ তার উপর ব'সে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

"কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে খুলেই বলুন না"—

"কাল রাত্রে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কি ক'রে যে এই সিন্ধুকের মধ্যে এলাম তা বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোনও ভৌতিক কাণ্ড, আমি এখনই ফিরে যেতে চাই, মা হয়তো কান্নাকাটি করছেন—"

"কি স্বপ্ন দেখেছিলেন আপনি—"

বিস্মিত বিজয় মল্লিক প্রশ্ন করলেন।

"দেখলাম যেন একটি অপরূপ সুন্দরী আমাকে এসে বলছেন—মা এইবার তুমি নিজের ঘরে চল। আমি উঠে দাঁড়ালাম, তিনি আমার হাত ধ'রে নিয়ে চললেন, তারপর ঘুমটা ভেঙে গেল—"

অজয়ের মায়ের বিরাট অয়েল পেন্টিংটা সামনের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। সেটা দেখে তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠে দাঁড়ালো শুচিতা।

"এঁকেই স্বপ্নে দেখেছিলাম। ইনি কে—ইনি কে?—"

বিজয় মল্লিকের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করেছিল। শুধু নির্বাক নয় ঈষৎ ব্যায়ত-আননও হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

"কার ছবি এটা বলুন না?"

"আমার স্ত্রীর—"

"কোথায় তিনি?"

"তিনি অনেকদিন আগে মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন! তাহলে এটা ভৌতিক কাণ্ড? আমি আর থাকব না, চললুম। আমার বড় ভয় করছে। এখান থেকে ষ্টেশন কত দূর? কোলকাতার ট্রেণ ক'টায়—"

"চলে যাবেন কেন! থাকুন না—আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি—"

"না আমার বড্ড ভয় করছে! আমি চললাম—মাপ করবেন!"

নাটকীয় ভঙ্গীতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল শুচিতা।

বিজয় মল্লিকও পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন। এসে দেখলেন মেয়েটি ষ্টেশনের রাস্তা ধ'রে ছুটছে। ষ্টেশনের রাস্তা কোন দিকে তা অজয়ের কাছ থেকে জেনে এসেছিল শুচিতা। বিজয় মল্লিক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"সুজিৎ সিং, মোটর নিকালো জলদি—"

অর্দ্ধ পথেই ধ'রে ফেললেন তিনি শুচিতাকে।

"চলুন আপনাকে পৌঁছে দি—"

"ষ্টেশন কতদূর এখান থেকে! আমি হেঁটেই চলে যাব। আপনি আর কেন কষ্ট করছেন!"

"আমি একেবারে আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি। আসুন—"

একটু ইতস্তত ক'রে শেষে মোটরে উঠে বসল সে। যতক্ষণ মোটরে ছিল, চুপ ক'রে বসেছিল একধারে জড-সড় হ'য়ে, আর মাঝে মাঝে কাঁদছিল।

বিজয় মল্লিক বারবার প্রশ্ন করছিলেন, "তুমি কাঁদছ কেন, কি হয়েছে—?"

শুচিতা উত্তর দেয় নি, মাথা নাচু ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে বসে ছিল নীরবে। বিজয় মল্লিক বিস্মিত এবং বিব্রত তো হয়েই ছিলেন, শুচিতার সান্নিধ্যে খানিকক্ষণ থেকে মুগ্ধও হয়ে গেলেন। চমৎকার মেয়েটি। সত্যিই লক্ষ্মির মতো চেহারা। ফিকে সবুজ শাড়িতে কি অদ্ভুত সুন্দরই না দেখাচ্ছে। কোলকাতার কাছাকাছি এসে শুচিতা হঠাৎ বললে—

"আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"রাখব বই কি। সম্ভব হলেই রাখব।"

"এই ঘটনার কথা কাউকে বলবেন না। আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, এ কথা শুনলে হয়তো ভেঙে যাবে।"

"ও—" কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন বিজয় মল্লিক। তারপর প্রশ্ন করলেন।—

"তোমরা কি জাত ?"

"আমরা কায়স্থ। ঘোষ আমাদের উপাধি।"

"তাই নাকি! তাহলে তো আমাদের পালটি ঘর।"

শুচিতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

কোলকাতার ভিতর যখন গাড়ী এসে পড়ল তখন বিজয় মল্লিক বললেন, "তোমাদের বাড়িটা কোথা—?"

"বাদুড় বাগানে।"

অজয়ের পরামর্শে সুবাসিনী বাসা বদল করেছিল। সেই ঠিকানায় বিজয় মল্লিক শুচিতাকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন। বাড়ির ঝিটা আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল—"ওমা এই যে দিদিমণি গো। মিছিমিছি থানায় খবর দেওয়া হল—"

শুচিতা নেবে সোজা বাড়ির ভিতর চলে গেল।

বিজয় মল্লিক ঝিকেই প্রশ্ন করতে লাগলেন।

"কি হয়েছিল বল তো—?"

"তাই কি আমরা জানি। রাত্রে মেয়ে খেয়ে দেয়ে শুল, তারপর কোথায় যেন উপে গেল। ঘরের খিল বন্ধ রয়েছে, সদর দরজায় খিলও বন্ধ রয়েছে অথচ দিদিমণি নেই। সমস্ত দিন শহর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছি আমরা। আপনি কোথা পেলেন ওঁকে— ?"

বিজয় মল্লিক শুচিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কথাটা ভাঙলেন না ঝিয়ের কাছে। আর একটা প্রশ্ন করলেন।

"বাড়িতে পুরুষ মানুষ কে আছে ?"

"কেউ নেই। বিধবা মা আছে শুধু—?"

"তার সঙ্গে দেখা হতে পাবে ?"

"দেখি জিগ্যেস করে—"

ঝি ভিতরে গেল। একটু পরে এসে খবর দিল—"না, উনি দেখা করবেন না।"

বিজয় মল্লিক ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর সোজা চ'লে গেলেন গুরুদেবের কাছে। তাঁর মনে হ'ল তিনি ছাড়া এই

জটিল রহস্যের সমাধান আর কেউ করতে পারবেন না। এখন তাঁরই উপদেশ অনুসারে চলাই নিরাপদ। সিন্ধুকের ভিতর রহস্যময় ভাবে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো যে মেয়েটিকে পাওয়া গেল তাকে ছেড়ে দেওয়া কি উচিত ?

মাধবানন্দ অতিশয় ভক্তিমান পুরুষ। তাঁর বিশ্বাস প্রবণতা অসাধারণ। বিজয় মল্লিকের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি রোমাঞ্চিত হলেন এবং বারবার হাত জোড় ক'রে প্রণাম করতে লাগলেন, কাকে তা ঠিক বোঝা গেল না। তারপর চোখ বুজে ব'সে রইলেন। বিজয় মল্লিক অস্থির হ'য়ে উঠছিলেন মনে মনে। তাঁর ভয় হ'তে লাগল গুরুদেব যদি সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েন তাহলে দু'তিন ঘণ্টার আগে চোখ খুলবেন না। তাই তিনি মুখ ফুটে বলেই ফেললেন—

"গুরুদেব আমার কি কর্তব্য এখন ব'লে দিন সেটা আগে।"

গুরুদেব চোখ খুলে বললেন—"ও মেয়েকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে—"

"সেটা কি ক'রে সম্ভব। পরের মেয়ে। বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনলাম, বিয়ে হ'য়ে গেলে পরের বৌ হবে, আমার বাড়িতে নিয়ে যাব কি ক'রে—?"

"যেমন ক'রে হোক নিয়ে যেতে হবে। যদি না নিয়ে যেতে পার অমঙ্গল হবে তোমার। এর মধ্যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না ?"

"পাচ্ছি। কিন্তু কি ক'রে সম্ভব হবে সেটা। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না—? ওরা আমাদের পালটি ঘর। অজয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাব করব ? সমীচীন হবে কি সেটা ?"

"অন্যায় তো কিছু মনে হচ্ছে না। মহাশক্তি নানারূপে ভক্তের কাছে আসেন, কখনও মা হয়ে, কখনও মেয়ে হ'য়ে, কখনও প্রিয়া হ'য়ে। অজস্র উদাহরণ আছে এর পুরাণে। আমার মনে হয় সেই চেষ্টাই কর তুমি। ও মেয়েকে বাড়িতে না নিয়ে যেতে পারলে ঘোর অমঙ্গল আশঙ্কা করছি—। মাধবানন্দের চোখ দুটি আবার বুজে এল। বিজয় মল্লিক উঠে পড়লেন।

কিন্তু তখনই তাঁর মনে পড়ল বিশ্বপতির শালী তাঁর কাছে গিয়েছিল গুরুদেবের চিঠি নিয়ে। তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, কেন করেছেন সে কথাটা গুরুদেবকে ব'লে যাওয়া উচিত। বললেন, "গুরুদেব, আপনার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে বিশ্বপতির শালী আমার কাছে গিয়েছিল, কিন্তু বিশ্বপতিকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি অত্যন্ত খারাপ লোক সে, তার মেয়ের সঙ্গে আমি অজয়ের বিয়ে দেব না। আশা করি এতে আপনি রাগ করবেন না—"

"না, না, রাগ করব কেন। ওই মেয়েটিও কিছুদিন আগে আমার কাছে মন্ত্র নিয়েছে, এসে অনুরোধ করলে তাই চিঠি লিখে দিলাম। এখন তো মনে হচ্ছে সবই মহামায়ার খেলা। তুমি যদি রাজি হয়ে যেতে তাহলেই—বুঝতে পারছ ইঙ্গিতটা"—

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাহলে মেয়েটির মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাবই করি গিয়ে। কি বলুন ?"

"তাই কর। তোমার ঠিক পালটি ঘরও যখন, তখন আর কথা কি।"

"অজয়ের কাছে যাই আগে, কি বলেন ?"

"হ্যাঁ তাই যাও ! ছেলে তোমার খুব ভাল, সে আপত্তি করবে না !"

বিজয় মল্লিক বেরিয়ে গেলেন অজয়ের উদ্দেশ্যে।

অজয়ও খুব ভাল অভিনয় করল। সে সন্দেহ করতে লাগল এর ভিতর কোনও 'ফাউল প্লে' আছে। সে বিজয় মল্লিককে নিয়ে গেল মোটর ড্রাইভার নিখিলের কাছে। নিখিল বলল, সে তো কিছুই বুঝতে পারে নি। মোটর ছেড়ে কোথাও যায় নি, কোথাও থামে নি পর্য্যন্ত। সেও খুব বিস্মিত হল শুনে।

"সিন্ধুকের ভিতর পিতলের লক্ষ্মী মূর্ত্তিটা ছিল তো ?"

"না। ছিল ওই জীবন্ত মেয়েটা।"

"কি আশ্চর্য্য—!"

বাবাকে নিয়ে অজয় যখন বাসায় ফিরে এল তখন বিজয় মল্লিক বললেন, "তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ, কিন্তু গুরুদেব আশ্চর্য্য হননি। তিনি বললেন পুরাণে এরকম অজস্র উদাহরণ আছে। আচ্ছা, তুমি যে মেয়েটির কথা লিখেছিলে তার কি হল—?"

"কি আবার হবে। আপনার চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম তাদের। তারপর তারা আর আসে নি।"

"আমার এখন মনে হচ্ছে, গুরুদেবও বলছেন, মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করি—"

"এই মেয়েটির সঙ্গে!"

ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করে অজয় এমন ভাবে চেয়ে রইল যেন এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

বিজয় মল্লিক বললেন, "ক্ষতি কি। মেয়েটি দেখতে চমৎকার, আমাদেব পালটি ঘর, তাছাড়া গুরুদেব যা বলছেন, তা যদি মানতে হয়, উনি যদি সত্যিই আমাদের ঘরেব লক্ষ্মীই হ'ন তাহলে ওকে বরণ করে' নিয়ে যাওয়াই উচিত। এ সুযোগ ত্যাগ করলে হয়তো আজীবন পস্তাতে হবে—"

অজয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বলল—"যা ভাল বোঝেন করুন। আমার আর বলবার কি থাকতে পারে—"

"তাহলে আমি মেয়ের মায়ের কাছে কথাটা পাড়ি গিয়ে—"

"পাড়ুন—"

সুবাসিনী এইবার সুযোগ পেলেন।

যে ছবিটিকে তিনি মনের মণিকোঠায় এতদিন টাঙিয়ে রেখেছিলেন সেই ছবিটি সত্যই এবার জীবন্ত হ'য়ে ওঠবার উপক্রম করল। সুবাসিনী বিজয় মল্লিকের সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন না। আড়াল থেকে কথাবার্ত্তা হল। বিজয় মল্লিক যখন খোঁজ নিলেন যে তাঁর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল তার কি হল তখন সুবাসিনী বললেন—"আমার মেয়ের বিয়ে হবে না। আমার মেয়ের

জন্মের পর আমার স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে চলে যান। তিনি যাবার আগে মেয়ের বিয়ের যে সব সর্ত্ত দিয়ে গেছেন তা এ যুগে কেউ মানবে না। তিনি বলে' গেছেন মেয়ের বিয়ে যদি না হয় তাহলে তাকে দীক্ষা দিয়ে কোনও ভাল মঠে পাঠিয়ে দিতে—"

"কি কি সর্ত্ত দিয়ে গেছেন তিনি—"

"প্রথম আমার কাছে হাতজোড় করে' মেয়েটিকে চাইতে হবে, দ্বিতীয় বিয়ের আগে আমাদের বংশ পরিচয় জানতে চাইতে পারবেন না, আমার যা খুশী তাই আমি দেব। আপনি বুঝতেই পারছেন এ যুগের কোনও ছেলের বাপই এর একটা সর্ত্ত মানতে চাইবেন না। তারপর এই যে অলৌকিক ঘটনাটা ঘটল এটা যদি জানাজানি হ'য়ে যায় তাহলে তো—"

বিজয় মল্লিক তাড়াতাড়ি বললেন—"না, তা জানাজানি হবে না। আচ্ছা, এখন উঠি পরে আপনার সঙ্গে দেখা করব আবার—"

"আবার দেখা করতে চাইছেন কেন?"

"সে তখনই বলব—"

বিজয় মল্লিক বেশ একটু দ্বিধায় পড়ে' গেলেন। ছেলের বিয়েতে মোটা পণ নেবার আকাঙ্খা তাঁর ছিল না। পণ না হয় না-ই পাওয়া গেল। কিন্তু আর দুটো সর্ত্ত যে বড় ভয়ঙ্কর! হাত জোড় করে' মেয়ে চাইতেই হবে? ছি ছি! তাছাড়া মেয়ের বংশ-পরিচয় না জেনে বিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক? একমাত্র ছেলে তাঁর। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন এ বিয়ে দেবেন না। যেমন ছিল তেমনি একটা লক্ষ্মী প্রতিমাই কিনে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন সিন্দুকের ভিতর। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটা অঘটন ঘটে গেল। তাঁর একটা ব্যাংকে কয়েক হাজার টাকা ছিল, সেই ব্যাংকটা ফেল করল হঠাৎ। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন বিজয় মল্লিক। ছুটে চলে' গেলেন আবার গুরুদেবের কাছে।

গুরুদেব সব শুনে বললেন—"ওই মেয়েকেই বরণ করে' নিয়ে যাও তুমি। আর দ্বিমত কোরো না—"

"কিন্তু মেয়ের মায়ের সর্ত্ত তো শুনলেন—"

"সেই জন্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে ও মেয়ে সাধারণ মেয়ে নয়। ওর পিতা সে কথা জানতেন, তাই হাত জোড় করে' চাইবার আদেশ দিয়ে গেছেন। আর ওকে যদি লক্ষ্মী বলেই মনে কর তাহলে হাত জোড় করতেই আপত্তিই বা কি। আর বংশ-পরিচয়? কার বংশের কতটুকু পরিচয় তুমি পেতে পার! ও মানুষ এইটিই কি ওর শ্রেষ্ঠ পরিচয় না? 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' চণ্ডীদাসের এই উক্তি কি তুমি শোননি—"

"শুনেছি। কিন্তু—"

"আর কিন্তু কোরো না!—আমার মনে হচ্ছে তোমার সিন্ধুক চুরিটাও মা লক্ষ্মির লীলা, এর ভিতরও নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে একটা। তা না হলে অতবড় সিন্ধুক চুরি করা কি সহজ ব্যাপার! তুমি আর ইতস্তত কোরো না—"

বিজয় মল্লিক বাসায় ফিরে আর একটি দুঃসংবাদ পেলেন। জমিদারীতে একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে, নায়েব মশাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। খুবই ঘাবড়ে গেলেন তিনি। তাঁর মনে হ'তে লাগল অপমানিতা লক্ষ্মির অভিশাপেই এই সব হচ্ছে বুঝি। আর বেশী দেরী করলে হয়তো সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। তিনি স্থির করলেন সর্ত্তগুলির কথা অজয়কে জানাবেন না। আজকালকার ছেলে, হয়তো বলে বসবে ও সর্ত্তে আমি বিয়ে করব না।

গোপনেই তিনি গেলেন পরদিন সুবাসিনীর বাসায়। ঝিকে দিয়ে খবর পাঠালেন। পাশের ঘরের পর্দার অন্তরালে সুবাসিনী এসে দাঁড়াল আবার।

"কি জন্যে ডেকেছেন আমাকে—"

"আমার একমাত্র ছেলে অজয়ের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। পণের কোনও দাবী আমার নেই। অন্য সর্ত্ত দুটিও আমি পালন করব। তবে ঝিটাকে বাইরে যেতে বলুন—"

সুবাসিনীর আদেশে ঝি বাইরে চলে গেল।

বিজয় মল্লিক তখন করজোড়ে বললেন—"আপনার মেয়েটিকে আমি পুত্রবধূ করতে চাই, দয়া করে অনুমতি দিন। আপনার বংশ-পরিচয় এখন

জানতে চাই না। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পরও কি সেটা জানাবেন না।"

সুবাসিনী বললেন, "জানাব। কিন্তু কেবল আপনাকে।"

"বেশ—!"

মহাসমারোহে বিবাহ হ'য়ে গেল।

কিন্তু নাটকটা জমল বিয়ের গোলমাল চুকে যাবার পর। এক নির্জ্জন দুপুরে বিজয় মল্লিক এসে বংশ-পরিচয়টা জানতে চাইলেন সুবাসিনীর কাছে। সুবাসিনী এতদিন আত্ম-প্রকাশ করেনি, আড়ালে আড়ালেই ছিল। সেদিন হঠাৎ সে সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, "বংশ-পরিচয় জানতে চাইছেন? এই দেখুন—"

বুকের কাপড়টা সরিয়ে দেখাল—বিজয় মল্লিকের নামটা জলজ্বল করছে সেখানে।

সুবাসিনী হেসে বলল—"পণও আমি দেব। আপনি আমাকে যে দশ হাজার টাকা দিয়েছেন তার থেকে একটি পয়সাও আমি খরচ করিনি। চেক বুক আর পাশ বুক যেমনকার তেমনি আছে। এই নিন—"

বিজয় মল্লিক প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন।

দাবি

ডাক্তার অরূপকুমার ক্রমাগত চিৎকার করিতেছেন, "আর কার কার দাবি আছে জানতে চাই—"

ব্যাপারটা তাহা হইলে গোড়া হইতে শুনুন।

ডাক্তার অরূপকুমার নিজে অবশ্য উদরের দাবিতে ব্যাপারটিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, কোন ব্যাপারেই নির্বিঘ্নে লিপ্ত হওয়া যায় না। সুখাদ্যও কেহ যদি মুখে পুরিয়া দেয়, তবু তাহা চর্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়। দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরা আটকাইয়া এই সরল ব্যাপারটাও সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে, তুচ্ছ একটা খড়্কের জন্য তখন অস্থির হইয়া পড়িতে হয়।

ডাক্তার অরূপকুমারকেও বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি যদি সোজাসুজি ডিস্‌পেনসারি খুলিয়া আর পাঁচজন ডাক্তারের মতো প্র্যাক্‌টিস করিতে বসিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্যা হয়তো এতটা জটিল হইত না। কিন্তু তিনি মফঃস্বল শহরে প্যাথোলজিস্ট হইয়া ডব্লিউ, আর (W. R.) নামক দুরূহ রক্ত পরীক্ষা করিয়া অর্থোপার্জন করিবেন মনস্থ করিলেন, সুতরাং প্রথমেই তাঁহাকে গিনিপিগের সন্ধানে ট্যারা পাখি-ওলাটার শরণাপন্ন হইতে হইল। কলিকাতা শহর নয়, মফঃস্বলে গিনিপিগ জোগাড় করা শক্ত। ট্যারা পাখি-ওলাটাই জোগাড় করিয়া দিতে পারে। অরূপ জানিতেন, লোকটা চড়াই পাখিকে 'আগ্‌গিন' এবং বাঁশপাতিকে 'হরবোলা' বলিয়া চালায়, অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সাধারণ পায়রাই 'গেরবাজ' নাম দিয়া

বিক্রয় করে। চুরির অপরাধে একবার জেলও খাটিয়াছিল। কিন্তু এই লোকটার খোশামোদ না করিলে মফঃস্বলে গিনিপিগ জোগাড় করা শক্ত। কেবলমাত্র পয়সায় কাজ হইবে না। কলিকাতা হইতে অবশ্য আনানো যায়, কিন্তু তাহা বড়ই ব্যয়সাধ্য। সুতরাং তাঁহাকে ট্যারা পাখি-ওলাটার শরণ লইতে হইল। প্রথমে সে তেমন গা করিল না। অনেক অনুরোধ করার পর বলিল, চেষ্টা করিয়া দেখিবে। চার পাঁচ দিন পরে দেখা গেল, তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই, কয়েকটি শীর্ণ লোম-ওঠা গিনিপিগ আনিয়া সে হাজির করিয়াছে। বলিল, অনেক কষ্টে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সুতরাং প্রতিটি গিনিপিগের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া দিতে হইবে। বলিল, ডাক্তারবাবুকে খাতির করে বলিয়া সে কম দামই চাহিতেছে। যদিও আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে লাগিল, তবু ডাক্তার অরূপকুমার দরদস্তুর করিতে ছাড়িলেন না। অবশেষে তিন টাকাতে রফা হইল। গিনিপিগ জুটিল, এবার খরগোস এবং ভেড়া চাই।

পাখি-ওলা বলিল, "আমিই আপনাকে খরগোস দিতে পারতাম। কিন্তু এ অঞ্চলের যত খরগোস সব দীনু মিঞা কিনে চালান দিচ্ছে। আপনি তাকে ধরুন। আমার কাছে মাঝে মাঝে সাঁওতালরা জংলী খরগোস বিক্রি করে যায়। তা-ও আমি দীনু মিঞার কাছেই পাঠিয়ে দিই। তার কাছেই আপনি খরগোস পাবেন—"

দাড়িতে মেহেদি লাগানো দীনু মিঞাকে অরূপবাবু মৎস্য-ব্যবসায়ী বলিয়াই জানিতেন। সে যে খরগোসের ব্যবসায় ধরিয়াছে, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল। দীনু মিঞার সহিত দেখা করিয়া তিনি দেখিলেন শুধু খরগোস নয়, নেউল, ইঁদুর, কাছিম, জোঁক প্রভৃতি জানোয়ার দীনু মিঞা নানাস্থানে চালান দেয়। এসব নাকি তাহার শাখা-ব্যবসায়। অরূপবাবুকে বলিল, "সাদা খরগোস তো সব চালান হয়ে গেছে। তবে ব্রৌন কাবুলী খরগোস একজোড়া আছে। দাম একটু বেশী লাগবে। পঁচিশ টাকা জোড়ায় বেচি, আপনি কুড়ি টাকা দেবেন।"

অরূপকুমার কাবুলী বিড়ালের কথা আগে শুনিয়াছিলেন, কাবুলী খরগোসের কথা প্রথম শুনিলেন। দীনু মিঞা খরগোস যখন বাহির করিল, তখন কিন্তু দেখা গেল 'কাবুলী' বিশেষণ সত্ত্বেও খরগোস দুইটি সাধারণ খরগোসের মতোই। রঙ্‌টা কেবল বাদামী। পুনরায় দরদস্তুর। কিছু দাম কমিল। অরূপবাবু বলিলেন, "আমার একটা ভেড়াও চাই মিঞা সাহেব—"

"ভেড়া তো আমি রাখি না। আপনি কিষণগঞ্জের হাটে লোক পাঠান। সেখানে সস্তায় ভেড়া পাবেন।"

ষোল টাকা দামে একটি ছোট ভেড়াও পাওয়া গেল।

এই ব্যাপারের জন্য ডাক্তারবাবুকে কয়েকটি মূল্যবান যন্ত্রপাতিও ইতিপূর্বে কিনিতে হইয়াছিল। দরদস্তুর করিবার সুযোগ পান নাই; কারণ যন্ত্রগুলি সবই বিদেশী, কিংবা বিদেশী জিনিসের স্বদেশী সমন্বয়, দাম একেবারে বাঁধাধরা। ইলেক্‌ট্রিক ওয়াটারবাথ, ইনকিউবেটার, সেনট্রিফিউজ, রেফ্রিজারেটার, কেমিক্যাল ব্যালান্স এবং খুঁটিনাটি আরও নানারকম কাচের জিনিসপত্র কিনিতে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা লাগিয়া গিয়াছিল। টাকাটা তাঁহার শ্বশুর দিয়াছিলেন।

অতঃপর, তিনি কাজ শুরু করিলেন। হিতৈষী ডাক্তারদের সুপারিশে পরীক্ষা করিবার জন্য রক্তও জুটিতে লাগিল। ডাক্তার অরূপের ক্লিনিকে সিফিলিস রোগাক্রান্ত নরনারীরা ভিড করিতে লাগিলেন। তিনি গিনিপিগ্‌ খরগোস এবং ভেড়ার রক্তের সহিত রোগী-রোগিণীর রক্ত মিশাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন কাহার রক্তে ভাসারম্যান রিয়াকৃশন্‌ (Wassermann Reaction) কিরূপ। এই টেস্‌ট্‌ পজিটিভ হইলে বোঝা যায় রোগীর রক্তে উপদংশের বিষ আছে কি না।

কিছুদিন তাঁহার ব্যবসায় ভালই চলিল। গুরুতর সমস্যাটি দেখা দিল পরে। দাবির প্রশ্নটা সম্ভবত খবরের কাগজের মাধ্যমেই তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের কাগজে কাগজে সীমানা-বিভাগ লইয়া তুমুল

আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, ঠিক ইহার কিছুদিন পূর্বে। প্রত্যেক প্রদেশবাসী তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছিল, ভারতবর্ষের মাটির উপর কাহার কতখানি দাবি। বিনোবাজীর ভূদান যজ্ঞেও এই একই দাবির প্রশ্ন—জমিতে আসল দাবি কাহার, জমিদারের, না চাষীর? প্রতিদিন দাবি-বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতেই সম্ভবত ডাক্তার অরূপের মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ তিনি অতিশয় ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রবন্ধ লিখিলেন না, তর্ক করিলেন না, বক্তৃতাও করিলেন না। স্বপ্ন দেখিলেন। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন।

দেখিলেন—একটি রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে তিনি এবং একটি বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি যেন মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বলিষ্ঠকায় ব্যক্তিটি তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ কটমট করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি যে রক্ত পরীক্ষা করে রোগীপিছু ষোল টাকা করে 'ফী' নাও, সে টাকায় কি তোমার একার দাবি? কতগুলি দাবিদার আছে দেখ।..."

যবনিকা সরিয়া গেল। অরূপ ডাক্তার সবিস্ময়ে দেখিলেন ট্যারা পাখি-ওলা এবং দাড়িতে-মেহেদি-লাগানো দীনু মিঞা দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা হাসিয়া বলিল, "আমরা আপনার জন্যে যা করেছি ক'টা টাকা দিয়ে কি তার মূল্য শোধ করা যায়। আপনি শিক্ষিত লোক, আমাদের আসল দাবির কথাটা আশা করি মনে রাখবেন। আমাদের দাবি সর্বাগ্রে—"

কথা কয়টি বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিং উঁচাইয়া প্রবেশ করিল ভেড়াটা। চোখোচোখি হইবামাত্র শুদ্ধ ভাষায় বলিল, "সপ্তাহে দুইবার করিয়া আমার রক্ত লইয়াছ। আমার দাবির কথা বিস্মৃত হইও না।" ভেড়া অন্তর্হিত হইল। তাহার পর আসিল গিনিপিগ্-খরগোশ-পার্টির সম্মিলিত শোভাযাত্রা। ডাক্তার অরূপ আশ্চর্য হইয়া গেলেন। প্রত্যেকেই পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া মানুষের মতো চলিতেছে। প্রত্যেকের হাতে রক্তবর্ণ পতাকা, তাহাতে বড় বড় করিয়া লেখা রহিয়াছে—"আমরা বুকের রক্ত দিয়েছি..." শোভাযাত্রা চলিয়া গেল। তাহার পর আসিলেন তিনজন বিদেশী। ভাষা শুনিয়া বোঝা গেল: একজন জার্মান, একজন সুইস্ এবং আর

একজন ইংরেজ। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাষায় বলিলেন, "আমরা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তোমাকে যদি সরবরাহ না করিতাম, তাহা হইলে কি তুমি রক্ত পরীক্ষা করিতে পারিতে? পাখি-ওলা এবং দীনু মিঞা ঠিক কথাই বলিয়াছে, কেবলমাত্র অর্থমূল্য দিলেই দাবি শেষ হয় না। ইহার একটা নৈতিক মূল্যও আছে। একটু ভাবিয়া দেখিও। গুড্ বাই…"

ডাক্তার অরূপ একটু বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিদেশী তিনজন চলিয়া যাইবার পর যিনি আসিলেন তাহাকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু অপ্রস্তুতও হইলেন। তিনি অন্য কেহ নন, তাঁহার পূজনীয় শ্বশুরমশায়, যিনি যন্ত্রাদি কিনিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য কিছু বলিলেন না, তাঁহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর একে একে আসিতে লাগিলেন তাঁহার শিক্ষকবৃন্দ। পাঠশালার পণ্ডিতমহাশয় হইতে শুরু করিয়া মেডিকেল কলেজের প্রফেসাররা পর্যন্ত। ইহারাও কেহ কোনও কথা বলিলেন না। তাঁহার দিকে গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একে একে চলিয়া গেলেন। অরূপবাবুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাঁহাদের দাবিও তুচ্ছ করিবার মতো নয়। বেশ ঘাবড়াইয়া গেলেন। পর মুহূর্তেই কিন্তু আরও ঘাবড়াইতে হইল। শিক্ষকরা চলিয়া গেলে আসিলেন সেইসব ডাক্তারেরা যাঁহারা তাঁহাকে বরাবর রোগী সরবরাহ করিয়াছেন। তাঁহারাও মুখে কেহ কিছু বলিলেন না, দুই একজন ডাক্তার কেবল ভুরু নাচাইলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিতে অরূপবাবুর কোনও কষ্ট হইল না। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারাও তাহার উপার্জনের কিছু অংশ দাবি করেন। ডাক্তাররা চলিয়া যাইবার পর যাহা ঘটিল, তাহা অপ্রত্যাশিত এবং রোমাঞ্চকর। অরূপবাবুর মৃত পিতামাতা আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন। পিতা বলিলেন, "আমরাই তোমাকে জন্মদান করিয়াছি, লালন-পালন করিয়াছি, লেখাপড়া শিখাইয়াছি। তোমার উপার্জনে আমরাও কিছু দাবি রাখি।" তাঁহারা অন্তর্হিত হইবার পর যাহা পরপর ঘটিল, তাহা আরও চমকপ্রদ। আরও দুই জোড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দেখা দিলেন। এক জোড়া বলিলেন, "আমরা তোমার

মাতামহ-মাতামহী।" তাহার পর চারজনেই সমস্বরে বলিলেন, "আমাদের ভুলো না।" বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাহার পর বহু বৃদ্ধবৃদ্ধার সমাগম হইল, সমস্ত রঙ্গমঞ্চটা যেন ভরিয়া গেল। প্র-বৃদ্ধ অতি-বৃদ্ধ পিতামহ-পিতামহী মাতামহ-মাতামহীরা আসিয়া নিজ নিজ দাবির কথা বলিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবুর মনে হইল উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের সকলেই বোধ হয় আসিয়াছেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ কলরব করিলেন, তাহার পর সহসা একযোগে অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর দেখা দিল ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। অম্লান কুসুমের মতো একদল শিশু। আধো আধো ভাষায় তাহারা বলিল, "আমরা এখনও জন্মাইনি, কিন্তু আমাদের কথাও মনে রেখ। আমাদের জন্যেও কিছু রেখ—।" শিশুরা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল, রঙ্গমঞ্চ কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্জন হইল। তাহার পর কলকণ্ঠের একটা হাসি ভাসিয়া আসিল। পরক্ষণেই স্খলিতবসনা স্খলিতচরণা এক তরুণীর পিছু পিছু দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিল এক তরুণ। তাহারা দুইজনেই ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমরা দুজনে যদি বিপথে না যেতাম তাহলে কার রক্ত নিয়ে ডব্লিউ, আর করতেন আপনি? সুতরাং আমাদেরও কিছু দাবি আছে, মনে রাখবেন!"—হাসিতে হাসিতে তাহারা চলিয়া গেল।

অরূপকুমার প্রত্যহ এই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। রাত্রে তো বটেই, দিনেও। চোখ বুজিলেই রঙ্গমঞ্চটা চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে।

শেষে তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন।

পাগলা গারদে বসিয়া দিনরাত চিৎকার করেন, "আর কার কার দাবি আছে জানতে চাই—"

পাগলা-গারদের ডাক্তার দাবি করিয়াছেন, "ডাক্তার অরূপকুমারের রক্ত ডব্লিউ আর পরীক্ষার জন্য পাঠানো হউক।"

অরূপকুমার রক্ত দিতে চান নাই। অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রক্ত লওয়া হইয়াছে। ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

শূন্যের দান

ভাদুড়ী মহাশয় গঙ্গার ধারে তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়া সেদিনও উপবেশন করিলেন। রোজই উপবেশন করেন। বৈকালে রোদটা যখন পড়িয়া আসে, তখন তিনি আর ঘরে থাকিতে পারেন না। একটা অদ্ভুত আকর্ষণ তাঁহাকে গঙ্গার ওই স্থানটির দিকে টানিতে থাকে।

স্থানটির যে বিশেষ কোন একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাহাও নয়। হেলিয়া পড়া একটা বটগাছের আড়ালে সামান্য একটু স্থান। আশেপাশে ঝোপ-ঝাড, ময়লা আবর্জনাও আছে। ভাদুড়ী মহাশয় যে স্থানে প্রত্যহ বসেন, কেবল সেই স্থানটি ছোট আসনের মত একটু জায়গা—বেশ পরিচ্ছন্ন। মনে হয় কেহ যেন পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। আসলে কিন্তু তাহা নয়, ভাদুড়ী মহাশয় রোজ ওই স্থানটিতে বসেন বলিয়া স্থানটি তৃণশূন্য। ভাদুড়ী মহাশয় প্রত্যহ আসিয়া যখন বসিতে যান তখন ওই তৃণশূন্য স্থানটুকু তাঁহার মনে অদ্ভুত একটা ভাবের সঞ্চার করে। একটু তিক্ত হাসি হাসিয়া ভাবেন, "আমার ছোঁয়াচ লেগে কচি ঘাসগুলো পর্যন্ত পুড়ে গেল!" ভাবেন, কিন্তু ঠিক সেই স্থানটিতেই আবার উপবেশন করেন। উপবেশন করিবার পূর্বে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া স্থানটি একবার ঝাড়িয়া লন। বহুদিন হইতেই এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি চলিতেছে।

ভাদুড়ী মহাশয়ের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। গভর্ণমেণ্টে চাকুরি করিতেন। ভাল চাকুরিই করিতেন, পঞ্চান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করিয়াছেন। যখন চাকুরি করিতেন, তখন তাঁহার মোটর ছিল, আরদালি-চাপরাশি ছিল, মানসম্ভ্রম ছিল, অনেক লোক ঝুঁকিয়া সেলাম করিত, ভাল ভাল বাড়িতে বাস করিতেন, তিন পুত্র এবং রূপসী পত্নী লইয়া তিনি বহুলোকের ঈর্ষাভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর কিছু নাই, সব গিয়াছে। বড় ছেলেটি কুসঙ্গে

পড়িয়া বহুদিন পূর্বে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কোন খবর তিনি আর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। মেজ ছেলের পত্নির সহিত তাঁহার পত্নির বনিবনাও হয় নাই, সে বহুকাল পূর্বে পৃথক হইয়া গিয়াছে। এখন মৌরাটে চাকরি করে। চিঠিপত্রও লেখে না। মেজ ছেলের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার ঠিক পরেই তিনি রিটায়ার করেন।

ঠিক এই সময়ে তাঁহার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরানন্দ স্বামীর সহিত দেখা হয়। তাঁহার এক বন্ধু স্বামিজীর নিকট মন্ত্র লইয়াছিলেন। বন্ধুর সহিত কয়েকদিন স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি শুনিলেন, তাহা নিজের অভিজ্ঞতার সহিতও মিলিয়া গেল। ইহাও তাঁহার মনে হইল এতকাল তো সংসারের মোহে আবদ্ধ হইয়া কলুর বলদের মত ঘানি টানিয়াছেন, এখন রিটায়ার করার পরও সংসার-পঙ্কে ডুবিয়া থাকার কোন অর্থ হয় না। এইবার পরলোকের চিন্তায় মন দেওয়া উচিত। তাঁহার বন্ধু বিনোদ লস্কর যখন দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে আলো দেখিতে পাইয়াছেন, মারোয়াড়ী পুরণমল যখন মন্ত্রের সাহায্যে নিজের আসন হইতে প্রায় এক বিঘৎ উঠিয়া শূন্যে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন তিনিই বা ব্যর্থকাম হইবেন কেন? ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার উহাই যদি পথ হয়, তাহা হইলে সে পথে চলিবার যোগ্যতা তাঁহারও নিশ্চয় আছে কিংবা হইবে। বিনোদ লস্কর স্কুলে, কলেজে, চাকুরির ক্ষেত্রে সব সময়ই তাঁহার তুলনায় হীনপ্রভ ছিলেন। স্বামিজীও তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন। সুতরাং রিটায়ার করার পর তিনি দীক্ষা লইয়া গুরু-প্রদর্শিত পন্থায় ভগবানের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত রহিলেন।

কিছুদিন ইহা লইয়া, আর কিছু না হোক, সময়টা বেশ কাটিতে লাগিল। নির্জন একটা ঘরে পদ্মাসনে বা সুখাসনে বসিয়া প্রাণায়াম করিতে ভালই লাগিত। সেই সময়টা অন্তত গৃহিণীর বাক্যবাণ হইতে রেহাই পাওয়া যাইত। এই পথে লাগিয়া থাকিলে হয়ত তিনিও ভ্রূ-যুগলের মধ্যে আলোক-বিন্দু দেখিতে পাইতেন, শূন্যেও হয়ত উঠিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি লাগিয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রথমত তাঁহার কৃতী তৃতীয় পুত্রটি হঠাৎ যখন

যক্ষ্মারোগে মারা গেল, তখন তিনি সহসা ধর্মেই বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন। কোনও করুণাময় সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার শক্তিই যেন তাঁহার আর রহিল না। দ্বিতীয়ত, কিছুদিন হইতে প্রাণায়াম করিবার সময় বুকের এক পাশে তিনি একটা বেদনা অনুভব করিতেছিলেন. একথা শুনিয়া একজন ডাক্তার তাঁহাকে প্রাণায়াম করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং গুরু-প্রদর্শিত পথে তিনি চলিতে পারিলেন না। গুরুর সংস্রবও তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। কারণ রিটায়ার করিয়া কলিকাতার যে বাসাটি ভাড়া করিয়া তিনি ছিলেন, পুত্রের মৃত্যুর পর সে বাসায় থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি দেশে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গার তীরে এক অখ্যাত পল্লীতে বহুকাল পূর্বে তাঁহার পূর্বপুরুষেরা বাস করিতেন। ভাদুড়ী মহাশয়ের পিতাও রিটায়ার করিবার পর দেশে গিয়াই বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দেশের বাড়ি খালি পড়িয়া ছিল। ভাদুড়ী মহাশয়ের কল্পনা ছিল সুবিধা মত খরিদ্দার পাইলে বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিবেন। স্থির করিয়াছিলেন কলিকাতাতেই বাকি জীবনটা অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। যে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি কলিকাতার গৃহস্থালী পাতিয়াছিলেন, সেই পুত্রই যখন বাঁচিল না তখন কলিকাতার সম্বন্ধে আর কোনও মোহ তাঁহার রহিল না। এমনিতেই কলিকাতায় বাস তাঁহার পক্ষে সুখকর ছিল না; যখন চাকুরি করিতেন, তখন ফাঁকা জায়গায় সুনির্মিত বড় বড় বাড়িতে তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইত। সে সব বাড়ির তুলনায় কলিকাতার এঁদো গলির মধ্যে অবস্থিত সঙ্কীর্ণ বাসাটি নরকবৎ। তাছাড়া প্রত্যহ থলি হাতে ভিড় ঠেলিয়া বাজার করা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার ছিল তাঁহার পক্ষে। এ সব কাজ পূর্বে তাঁহার আরদালিরা করিত। কিন্তু এখন অত বেতন দিয়া চাকর রাখিবার সামর্থ্য নাই। নিজেকেই বাজার করিতে হয়। আয় কমিয়া গিয়াছিল, তৃতীয় পুত্রের পড়া তখনও শেষ হয় নাই। তাছাড়া চিররুগ্না গৃহিনীর চিকিৎসার জন্য অনেক খরচ হইত। চাকর রাখিবার মত উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে থাকিত না। পুত্রের জন্যই কষ্ট করিয়া কলিকাতায় ছিলেন, পুত্রই যখন

চলিয়া গেল, তখন তিনি কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া পূর্বপুরুষদের ভিটায় ফিরিয়া আসিলেন।

প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ সুখেই ছিলেন। বাড়িটি পাকা, বেশ প্রশস্ত উঠান। পাশেই একটি পুষ্করিণী। উঠানে তরিতরকারি লাগাইয়া, পুকুরে মাছ ধরিয়া, পাড়াপড়শীদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিয়া একটা নূতন জীবনের স্বাদ কিছু দিনের জন্য তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র কিছু দিনের জন্য। গৃহিণীর স্বাস্থ্য পূর্বেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, বাতের প্রকোপে তিনি সাধারণত শয্যাগতই থাকিতেন, পল্লীগ্রামে আসিয়া ইহার উপর তাঁহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিল। ডাক্তার থাকেন দুই ক্রোশ দূরে। পদব্রজে গিয়া তাঁহাকে খবর দিতে হয়। খবর দিবার পরও তিনি সঙ্গে সঙ্গে আসেন না, আসিতে পারেন না। অনেক সময় একদিন, কখনও কখনও দুইদিন পরে আসেন। পোস্টাফিস হইতে ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনিন কিনিয়া কিছুদিন চালাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পোস্টাফিসও কাছে নয়, প্রায় মাইল দুই দূরে। কুইনিন ফুরাইয়া গেলে পোস্টাফিস হইতেও আনা সব সময় হইয়া উঠিত না। কারণ তিনি নিজেও মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। কম্প দিয়া জ্বর আসিত, পেটে গোলমাল তো ছিলই, তাছাড়া বয়স ক্রমশ বাড়িতেছিল, দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। সুতরাং এমন দিনও মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতে লাগিল যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অসুখে পড়িয়া আছেন, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিবার লোক নাই। পল্লীগ্রামে চাকর বা রাঁধুনী পাওয়া সহজ নয়, অনেক খোশামোদ করিয়া একটি স্থবিরা ব্রাহ্মণীকে তিনি পাচিকা-রূপে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে-ও মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া পড়িত। একটি বাগ্দী বউ আসিয়া কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা প্রভৃতি করিত। কিন্তু তাহাকে লইয়াও শান্তি ছিল না। সে যুবতী ছিল, কথায় কথায় ফিক ফিক করিয়া হাসিত, ভাদুড়ী মহাশয়ের সহধর্মিণী সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, বৃদ্ধ ভাদুড়ী মহাশয় গোপনে গোপনে হয়ত উহার সহিত অবৈধ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। কোনও প্রমাণ ছিল না। কিন্তু সন্দেহ প্রমাণের উপর নির্ভর করে না।

ভাদুড়ী মহাশয় চলৎশক্তিরহিত না হইলে প্রায়ই বাড়ির বাহিরে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু বাহিরে গিয়া তাঁহাকে আরও বিপদে পড়িতে হইত। বাহিরে বসিবার স্থান কোথায়? একটু দূরে মিত্র মহাশয়ও আছেন, ভাদুড়ী মহাশয় গেলে তিনি অভ্যর্থনাও করেন, কিন্তু ভাদুড়ী মহাশয় সেখানে যাইতে চান না। পরনিন্দা, পরচর্চা, বর্তমান গভর্নমেন্টের অক্ষমতা, খাদ্যদ্রব্যের অভাব প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোনও প্রকার আলোচনা করিতে মিত্র মহাশয় হয় অপারগ না হয় অনিচ্ছুক। ভাদুড়ী মহাশয়ের ওসব ভাল লাগে না। সুতরাং তিনি মিত্র মহাশয়কে পারতপক্ষে এড়াইয়া চলেন।

মিত্র মহাশয়কে বাদ দিলে কাছাকাছি আর দুইটি মাত্র বাড়ি বাকি থাকে। কিন্তু সে দুইটিও অগম্য। একটি চৌধুরীদের বাড়ি, সেখানে নানাবয়সের বহু বিধবা বাড়ির বৃদ্ধ চাকর নিতাইচরণের তত্ত্বাবধানে থাকে। বাড়ির কর্তা কলিকাতার 'চৌধুরী অ্যাণ্ড দাস' নামক লৌহব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্ধ-স্বত্বাধিকারী। তিনি নিজে সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন, আত্মীয় বিধবাগুলিকে তিনি দেশের বাড়িটি ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিছু জমি আছে, বৃদ্ধ ভৃত্য নিতাইচরণের আনুকূল্যে সেই জমি হইতে বৎসরের খাবারটা সংগৃহীত হয়। চৌধুরী মহাশয় মাসে মাসে ত্রিশটি টাকাও নিতাইচরণের নিকট পাঠান। জনশ্রুতি এই ত্রিশ টাকার অংশ লইয়া বারটি বিধবার মধ্যে মাঝে মাঝে তুমুল কলহ বাধিয়া যায়। যেদিন পিওন আসিয়া টাকাটি দিয়া যায় তাহার পর তিন চারদিন বাড়িতে নাকি কাক-চিল পর্যন্ত বসিতে সাহস করে না।

দ্বিতীয় বাড়িটি অপুত্রক কেনারাম চক্রবর্তীর। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শুচি-বায়ুগ্রস্ত। স্নান করা, হাত ধোয়া, চতুর্দিকে গোবরজল এবং গঙ্গাজল ছিটানো এই সব লইয়াই থাকেন তাঁহারা। ভাদুড়ী মহাশয় দুই একবার তাঁহাদের বাড়িতে গিয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চক্রবর্তী মহাশয় লোক খারাপ নন, হাসিমুখেই আলাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই ভাদুড়ী মহাশয়ের কেমন যেন সন্দেহ হইয়াছিল যে যদিও কেনারামবাবু মুখে ভদ্রতার চূড়ান্ত করিতেছেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহার একটা অস্বস্তি হইতেছে। তাঁহার

চোখের ভাষা অন্যরকম। একদিন তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, তিনি উঠিয়া আসিবার পরই চক্রবর্তী-গৃহিণী ভিতর হইতে এক বালতি গোবরজল পাঠাইয়া দিলেন এবং যে স্থানে ভাদুড়ী মহাশয় বসিয়াছিলেন সেই স্থানটি চক্রবর্তী মহাশয় স্বহস্তে পূর্ণ উদ্যম সহকারে ধুইতে লাগিলেন। ইহার পর ভাদুড়ী মহাশয় আর চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে পদার্পণ করেন নাই।

সুতরাং বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ভাদুড়ী মহাশয় একটু মুশকিলে পড়িয়া যাইতেন। কোথাও আশ্রয় নাই। কলিকাতার পার্কগুলির কথা মনে পড়িত, চায়ের দোকানগুলি বিশেষ করিয়া বোস মহাশয়ের ছোট দোকানটির ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু কলিকাতায় ফিরিবার আর উপায় নাই, ইচ্ছাও নাই। লজ্জার মাথা খাইয়া মেজছেলেকে একটা চিঠি লিখিয়াছিলেন, মেজ ছেলে তাহার উত্তরও দিয়াছিল। লিখিয়াছিল 'আপনি ও মা এখানে চলিয়া আসুন। দেশে কষ্ট করিয়া পড়িয়া থাকিবার দরকার কি!' তাঁহার স্ত্রী কিন্তু যাইতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, শ্বশুরের ভিটা আঁকড়াইয়া শত কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি গ্রামে পড়িয়া থাকিবেন তবু পুত্রবধূর হাত তোলা হইয়া থাকিতে পারিবেন না। স্বামীর আত্মসম্মানহীনতার জন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি গঞ্জনাও দিলেন। ভাদুড়ী মহাশয় অনুভব করিলেন তিনি দঁকে অর্থাৎ কর্দমে আটকাইয়া গিয়াছেন এবং এইভাবেই বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে। কাটাইতে তাঁহার আপত্তি ছিল না, অসুস্থ এবং রুগ্ন স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিয়া, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া, এই অজ পাড়াগাঁয়ে বাকী জীবনটা কাটাইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল কি লইয়া থাকিবেন? মনের কিছু একটা অবলম্বন চাই তো। ধর্মের উপর আর আস্থা ছিল না, সময় পাইলে মাঝে মাঝে বই পড়িতেন, কিছু বই তাঁহার ছিল। কিন্তু কতক্ষণ বই পড়া যায়? সর্বাপেক্ষা মুস্কিল হইত বিকাল বেলাটা। যখন চাকুরী করিতেন, ক্লাবের মেম্বর ছিলেন, টেনিস খেলিতেন, ব্রিজ খেলিতেন, সময় কাটাইবার কত উপায় ছিল। কিন্তু এই গ্রামে ক্লাব দূরের কথা, পোস্টাফিস নাই, রেলওয়ে ষ্টেশন নাই। গঙ্গার ওপারে ষ্টেশন। সেখানে নামিয়া নৌকাযোগে এখানে আসিতে হয়।

ভাদুড়ী মহাশয় অবশেষে বাধ্য হইয়া একদিন গঙ্গাতীরে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন ওই স্থানটুকু ছাড়া গ্রামে নির্ঝঞ্ঝাটে বসিবার আর কোন স্থান নাই। এদিক-ওদিক চাহিয়া হেলিয়া-পড়া বটগাছটার নীচে ওই স্থানটুকু তিনি আবিষ্কার করিলেন। গঙ্গাতীরে ওই স্থানটুকু যে তাহার সমস্যার সমাধান করিবে একথা অবশ্য তিনি কল্পনা করেন নাই। কিন্তু বসিবামাত্র তিনি অনুভব করিলেন—ঠিক কি যে অনুভব করিলেন তাহা বর্ণনা করা শক্ত—তবে একটা অননুভূতপূর্ব আরাম যেন তাঁহার সত্তাকে সহসা আচ্ছন্ন করিয়া দিল। আকাশের দিকে চাহিয়া সহসা তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন, নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। উত্তরবাহিনী গঙ্গা সোজা গিয়া উত্তর আকাশে মিশিয়াছে, বামে পশ্চিম আকাশের মেঘমালায় অস্তায়মান সূর্যের বিচিত্র বর্ণমালা, সে বর্ণের আভা গঙ্গার বুকে এবং উত্তর আকাশের স্তূপীকৃত মেঘে প্রতিফলিত হইয়াছে। গঙ্গা চিরকালই বহিতেছে, আকাশে মেঘের আবির্ভাবও কোনও নূতন ঘটনা নহে, কিন্তু সেদিন তাঁহার চক্ষে সবই যেন বড় নূতন ঠেকিল। তিনি মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর হইতে রোজই তিনি ওই স্থানটিতে গিয়া বসেন। গত দশ বছর হইতে প্রত্যহ বসিতেছেন। প্রতিদিন ওই উত্তর আকাশে নূতন ছবি দেখিতে পান। কোনদিন মেঘ থাকে কোন দিন থাকে না। যে দিন থাকে সেদিন নূতন ধরনে থাকে, কখনও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয় না। রোজই নূতন ছবি, সে ছবিও চোখের সামনেই ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। পশ্চিম আকাশেও ঠিক তাই। প্রতিদিনে নূতন ঢং নূতন দৃশ্য। গঙ্গার তরঙ্গমালাও যেন প্রতিদিন নূতন রূপে সাজিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। বৈকালের এই সময়টুকুর জন্য ভাদুড়ী মহাশয় উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকেন, এই সময়টুকুও যেন অভিনব সাজে সাজিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করে। এই দশ বৎসরে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার মেজছেলেটিও আর নাই, প্লেগে আক্রান্ত হইয়া সে সপরিবারে মারা গিয়াছে। যে স্থবিরা ব্রাহ্মণী তাঁহার বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করিত, সে বহুপূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছে। বাগ্দী মেয়েটি শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে। ভাদুড়ী

মহাশয় এখন সম্পূর্ণ একা—একবেলা স্বপাক খান। রান্নার আয়োজন করিতে সকালটুকু কাটিয়া যায়। আহার করিয়া সামান্য একটু বিশ্রাম করেন, তাহার পর গঙ্গার ধারের ওই স্থানটুকুতে গিয়া বসেন।

যেদিনের কথা বলিতেছি সেদিন ভাদুড়ী মহাশয় আহারাদির পর একটা পুরাতন মাসিক পত্রিকা খুলিয়াছিলেন। তাহাতে ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি একটা অদ্ভুত জিনিস পাঠ করিলেন—'যখন অস্তিত্বও ছিল না, নাস্তিত্বও ছিল না, যখন পৃথিবী ছিল না, পৃথিবীর ঊর্ধ্বে আকাশও ছিল না, তখন কি ছিল? তখন কে সেই মহা অন্ধকারের গর্ভে নিহিত ছিলেন? যখন মৃত্যু ছিল না, অমৃত্যুও ছিল না, দিবারাত্রির বিভেদ যখন ছিল না, তখন সেই নিগূঢ় অন্ধকারের মধ্যে, সেই মহাশূন্যে অপ্রত্যক্ষভাবে তিনিই স্পন্দিত হইতেছিলেন। তিনিই কালক্রমে তেজোরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। প্রথমে আবির্ভূত হইল কামনা…'

এই ধরনের অনেক কথা ছিল। পড়িতে পড়িতে ভাদুড়ী মহাশয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। গঙ্গার তীরে বসিয়া কথাগুলি পুনরায় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল মহাশূন্যের মধ্যেই সৃষ্টি-সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁহার জীবনও তো এখন মহাশূন্যে, সে শূন্যতার মধ্যে কোনও সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে কি? তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মুখে একটা তিক্ত অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি উত্তর আকাশের মহাশূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উত্তর আকাশে কিছু দুগ্ধ-শুভ্র স্তূপ-মেঘ একাধারে স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা ভাদুড়ী মহাশয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল খানিকটা মেঘ আকাশ হইতে খুলিয়া গিয়া যেন তাঁহার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। একটু পরেই অবশ্য তাঁহার ভুল ভাঙিল। মেঘ নয়, নৌকার পাল। নৌকাটির দিকেই তিনি চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণ চাহিয়া ছিলেন তাঁহার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন নৌকাটি খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটের ঘাটেই ভিড়িল।

নৌকায় একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পাশেই একটি সুন্দরী মহিলা। চার পাঁচটি নানা বয়সের ছেলেমেয়েও রহিয়াছে।

ভদ্রলোক নৌকা হইতে নামিয়া ভাদুড়ী মহাশয়কেই প্রশ্ন করিলেন, "বলতে পারেন হরনাথ ভাদুড়ীর বাড়ি কোনটা—?"

"কেন—তাঁর বাড়ি খুঁজছেন কেন আপনি ?"

"আমি তাঁর বড় ছেলে। অনেকদিন বিদেশে ছিলাম। অনেকদিন পরে ফিরেছি। কলকাতায় তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি বললেন বাবা এখানেই আছেন।"

"কে নবু—?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত সবিস্ময়ে ভাদুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নবকুমার পিতাকে সত্যই চিনিতে পারেন নাই। তাহার পর হঠাৎ পারিলেন এবং আসিয়া প্রণাম করিলেন।

"এরা কে—"

"আমি রেঙ্গুনে বিয়ে করেছিলাম। সবাইকে নিয়ে এসেছি—"

সকলে আসিয়া একে একে প্রণাম করিতে লাগিল। পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী সবাই আবার তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার শূন্য জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে আবার পূর্ণ হইয়া গেল।

ভ্রাতৃপ্রেম

প্রৌঢ় ভবানন্দ সেন নিজের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। ডাক্তার ব্রহ্মচারী তখন সবে তাঁহার গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার ঔষধ বাজারে তখনও চালু হয় নাই। ভবানন্দ সেনের কালাজ্বর হইয়াছিল। স্বয়ং ব্রহ্মচারীই চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন, ভবানন্দের পুত্র শ্যামানন্দ মেডিকেল কলেজে পড়িত, সুতরাং ছোট বড় মাঝারি আরও কয়েকজন ডাক্তারও জুটিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফলই হইতেছিল না। সকলে হিম-সিম খাইতেছিলেন মাত্র। কুইনাইন এবং আর্সেনিকের শ্রাদ্ধ হইতেছিল, তাহার সঙ্গে গোপনে গোপনে চলিতেছিল হোমিওপ্যাথি এবং কবিরাজি পাঁচন। বাংলা দেশের অনেকেই সময়নিষ্ঠ নহেন, জ্বর কিন্তু এক মিনিটও দেরী করে না। ঠিক যথাসময়ে আসে। ভবানন্দের বেলাতেও ইহার অন্যথা হইল না। ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া জ্বর প্রত্যহ দুইবার করিয়া হাজিরা দিতে লাগিল। ভবানন্দ-গৃহিণী তখন অনন্যোপায় হইয়া কুলপুরোহিত কালিকানন্দ শর্মাকে খবর দিলেন।

তিনি আসিয়া ব্যবস্থা দিলেন চণ্ডীপাঠের এবং কালীপূজার। তাহাও চলিতে লাগিল।

ডাক্তাররা সকলেই একটি কথা বারবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন, সাবধান পেট যেন না খারাপ হয়। পেট ভাঙিলেই সর্বনাশ হইয়া যাইবে। কালাজ্বর রোগীরা সাধারণত খুব লোভী হয়, কুপথ্য করার দিকেই তাহাদের ঝোঁক বেশী। এ বিষয়ে যেন একটু কড়া নজর রাখা হয়। পুত্র শ্যামানন্দ এবং গৃহিণী মৃন্ময়ী সর্বতোভাবে মনোযোগী হইলেন এ বিষয়ে। বাড়িতে মশলা কেনাই বন্ধ হইয়া গেল। মৌরলা মাছ ছাড়া অন্য কোনও প্রকার মাছও

আর তাঁহারা কিনিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু এ সব সাবধানতা সত্ত্বেও একদিন পেটের গোলমাল দেখা দিল।

ডাক্তাররা আসিয়া মৃন্ময়ীকে জেরা করিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ী বলিলেন দশ বৎসরের পুরাতন চাউল এবং মৌরলা মাছের মশলাহীন ঝোলের অপেক্ষা গুরুতর কোনও পথ্য স্বামীকে তিনি দেন না।

একজন ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, "দুধ কতটা খাচ্ছেন ?"

"দু-বেলায় তিন পোয়া"—

"জল মিশিয়ে দেন তো !"

"না, জল মেশাই না। কোলকাতার দুধে এমনিই তো জল অনেক থাকে—"

"না, জল মিশিয়ে দেবেন।"

জল মিশাইতে গিয়া মৃন্ময়ী অনুভব করিলেন যে জল মিশাইলে দুধের রং-ও বজায় থাকিবে না। কিন্তু ডাক্তারদের নির্দেশ অমান্য কবিতে তিনি সাহস করিলেন না।

পেটের গোলমাল কিন্তু যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। জ্বরও। ভবানন্দ দেখিলেন ডাক্তাররা তাঁহার খাবার ছাড়া আরও কিছুই কমাইতে পারিতেছেন না। হঠাৎ তিনি মরীয়া হইয়া উঠিলেন। মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, "এরা আমাকে না খেতে দিয়েই মেবে ফেলবে দেখছি। এদের কথা আমি আর শুনব না। আমি আজ রাত্রে আর বার্লি খাব না, লুচি খাব !"

"লুচি ?"

"হ্যাঁ, গরম ফুলকো লুচি খেলে পেটটা ধ'রে যেতে পারে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে—"

"কিন্তু শামু এসে যদি শোনে আমি তোমাকে লুচি দিয়েছি তাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে সে।"

"তাকে শোনাবার দরকার কি। সে তো সাড়ে আটটার আগে ফিরবে না। তার আগেই আমি খেয়ে নেব।"

"কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?"

"খুব ঠিক হবে, আমি যা বলছি তাই কর। বেশী নয়, গোটা পাঁচ ছয় লুচি বেগুন-ভাজা দিয়ে খাব। আমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আমার ইচ্ছায় আর তোমরা বাধা দিও না।"

মৃন্ময়ীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। তিনি লুচি ভাজিবারই আয়োজন করিতে গেলেন।

…উনুনের কাছেই ভবানন্দ খাইতে বসিয়াছিলেন। সবে একখানি মাত্র লুচি থালার উপর দেওয়া হইয়াছে, অত্যন্ত গরম বলিয়া ভবানন্দ সেটি তখনও ভালভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এমন সময়, পুত্র শ্যামানন্দ আসিয়া উপস্থিত।

"এ কি!—"

"উনি লুচি খাবেন বলে জেদ ধরেছেন"—মৃন্ময়ী বলিলেন।

"ডাক্তাররা বার্লি দিতে বলেছে, তুমি লুচি দিচ্ছ?"

"আমি কি করব বাবা! ওঁকে বল—"

ভবানন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "আমি লুচি খাবই। তোমার ও ডাক্তারেরা গবেট্, কিচ্ছু জানে না"—

"না, লুচি খাওয়া হবে না।"

আমি খাবই—ভবানন্দ গর্জন করিয়া উঠিলেন। শ্যামানন্দ তর্ক না করিয়া লুচি সুদ্ধ থালাটা তুলিয়া লইল। ভবানন্দ রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন। সেদিন রাত্রে জলস্পর্শ পর্যন্ত করিলেন না।

পরদিন প্রভাতে ভবানন্দ পাটনা-প্রবাসী ভ্রাতা পরমানন্দকে নিম্নলিখিত পত্রটি লিখিলেন।

কল্যাণবরেষু,

কিছু টাকার জন্য ইতিপূর্বে একটি পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহার কোনও উত্তর পর্যন্ত দিলে না। এখানে জলের মতো অর্থব্যয়

হইতেছে, কিন্তু অসুখের কোনও উপশম নাই। মনে হইতেছে আর বেশী দিন বাঁচিব না। তোমার বউদিদি এবং শামুও আমার সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। হাতী কাদায় পড়িলে ব্যাঙেও তাহাকে লাথি মারে। তুমি যদি আমাকে শেষ দেখা দেখিতে চাও, এই পত্রকে টেলিগ্রাম জ্ঞান করিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। হাতে পয়সা থাকিলে টেলিগ্রামই করিতাম, কিন্তু পয়সা তোমার বউদির কাছে থাকে। চাহিলে দেয় না। তাহার ধারণা হাতে পয়সা পাইলে আমি কুপথ্য কিনিয়া খাইব। এখন মরাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তুমি পত্র পাইয়াই চলিয়া আসিবে। সাক্ষাতে সব কথাই বলিব। আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

আশীর্বাদক
ভবানন্দ সেন।

পরমানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই চোখে জল আসিয়া পড়িল। এমন কি শ্যামসুন্দরেরও।

"আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। আমার বাবাকে আর সামলাতে পাচ্ছি না।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে পরমানন্দ উত্তর দিলেন, "ভয় কি সব ঠিক হয়ে যাবে—"

শ্যামানন্দ নিশ্চিন্ত হইয়া কলেজে চলিয়া গেল।

ইহার কিছুক্ষণ পরে ঘরে খিল বন্ধ করিয়া দুই ভ্রাতায় মিলিয়া কি যে পরামর্শ করিলেন তাহা মৃন্ময়ী টের পাইলেন না। দ্বারে কান দিয়া শুনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ কিছু শুনিতে পান নাই।···

···বেলা তিনটার সময় পরমানন্দ দিবানিদ্রা সাঙ্গ করিয়া উঠিলেন। রাত্রে ট্রেনে না কি ঘুম হয় নাই।

মৃন্ময়ী প্রশ্ন করিলেন, "চা করে' দেব ঠাকুরপো?"

"না। দাদাকে নিয়ে এখুনি একবার বেরুব। আমার পরিচিত একটি ভালো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন, তাঁকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেক কালাজ্বর রোগী তিনি আরাম করেছেন শুনেছি।"

"তাঁকে বাড়িতেই 'কল' দাও না। তোমার দাদা কি যেতে পারবেন ?"

"তিনি 'কল' দিলে আসেন না। তাঁর বাড়িতে যেতে হয়। আমরা গাড়ি ক'রে যাব। তুমি চাকরটাকে বল একটা রিক্‌শা ডেকে দিক—"

"এই পাড়াতেই একটা রিকশা-ওলা থাকে, চেনা-শোনা লোক। মোহন দেখ তো চামরু যদি থাকে তাকে ডেকে আন !"

চামরুর রিক্‌শাতে আরোহণ করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে দুই ভাই রিক্‌শাতে চড়িয়া যাত্রা করিলেন। ফিরিলেন ঘণ্টা দুই পরে।

শ্যামানন্দও তখন কলেজ হইতে ফিরিয়াছিল। সে খুড়ামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন ডাক্তারের কাছে বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ?"

"সে তুই চিনবি না, আমার এক গুরু ভাই। বেলেঘাটায় থাকে।"

রাত্রে শুইবার সময় পরমানন্দ লক্ষ্য করিলেন টেবিলের উপর একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া ভবানন্দ খবরের কাগজ পড়িতেছেন। 'বাল্‌ব'টা হঠাৎ ফিউজড হইয়া গিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া কিছুক্ষণ না পড়িলে ভবানন্দের ঘুম আসে না। মোমবাতির কাছে মশারিটা বাতাসে দুলিতেছে। পরমানন্দের আশঙ্কা হইতে লাগিল মশারিতে আগুন ধরিয়া গেলেই মুশকিল !…এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

"পর্মা, ওরে পর্মা—"

ভবানন্দের কাতর ডাকে পরমানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। মশারির ভিতর তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি উজ্জ্বল আলো তাঁহার চোখ ধাঁধাইয়া দিল। ভবানন্দের পাশেই যে বাথরুম এবং তাহাতে যে একটি বেশী শক্তিশালী 'বালব' লাগানো আছে তাহা পরমানন্দ জানিতেন না। তিনি মশারির ভিতর বসিয়াই পট পট করিয়া নিজের মশারির দড়িগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পরই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

ইহার একটু পরেই গুরুভার পতনের শব্দে শ্যামানন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল আপাদমস্তক মশারি জড়াইয়া পরমানন্দ পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে গুরুতর চোট লাগিয়াছে।

ভবানন্দ ক্ষীণকণ্ঠে বাথরুম হইতে বলিলেন, "শামু এখানে আয়। আমি উঠতে পাচ্ছি না। জলের মতো পায়খানা হয়ে যাচ্ছে খালি।"

শামু একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া উভয়কে লইয়া মেডিকেল কলেজে চলিয়া গেল।

পরদিন রিক্‌শা-চালক চামরু বলিল, উঁহারা কোন ডাক্তারের কাছে যান নাই, একটি খাবারের দোকানে বসিয়া লুচি, বুটের ডাল. আলুর দম এবং রাজভোগ খাইয়াছেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এখনও উল্লেখ করি নাই। ভবানন্দ সেন একজন প্রবীণ ডাক্তার এবং পরমানন্দ সেন প্রবীণ শিক্ষক।

বীরেন্দ্রনারায়ণ

শীতের রাত্রি। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলাম। সদ্য বিবাহিতা পত্নী পাশের ঘরে সেতার সাধিতেছিলেন। কাফির গৎটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ রস-ভঙ্গ হইল। নীচে কড়াটা নড়িয়া উঠিল এবং একটু পরে ভৃত্য মণিলাল একটি পত্র হস্তে প্রবেশ করিল।

"নবীপুরের জমিদার বাড়ি থেকে আপনাকে ডাকতে এসেছে—"

লেপ ছাড়িয়া উঠিতে হইল। পত্রটি দেখিলাম স্বয়ং জমিদারবাবুই লিখিয়াছেন।

ডাক্তারবাবু,

আমার ছেলেটি বড অসুস্থ। আপনি পত্র পাইবামাত্র চলিয়া আসুন। আপনার জন্য নৌকা পাঠাইলাম। ইতি—

বীরেন্দ্রনারায়ণ

পত্রটার অভাব্য ভঙ্গীতে আত্মসম্মান ঈষৎ আহত হইল। আমি উঁহার খাতকও নহি, কর্ম্মচারিও নহি। আমাকে এমন আদেশের ভঙ্গীতে চিঠি লেখার অর্থ কি? একটা 'নমস্কারান্তে নিবেদন' বা 'বিনীত বীরেন্দ্রনারায়ণ' লিখিলে ক্ষতি কি ছিল! লোকটা শুনিয়াছি দুর্দ্দান্ত জমিদার। টাকার জোরে সত্যকে মিথ্যা এবং দিনকে রাত্রি করিয়া নিজের জমিদারির সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের লোকেদেরও নিস্তার নাই। সকলকে শাসাইয়া চোখ রাঙ্গাইয়া নিজের মহিমা-পতাকাটাকে সদর্পে সমুচ্চ করিয়া রাখাটাই যেন লোকটার একমাত্র লক্ষ্য। আমি মাত্র মাসখানেক আগে এই

গ্রামে প্র্যাক্‌টিস করিতে আসিয়াছি। গ্রামটি বীরেন্দ্রনারায়ণেরই জমিদারিভুক্ত, কিন্তু তাহার সহিত চাক্ষুস আলাপ এখনও পর্যন্ত হয় নাই। লোকটার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে আলাপ করিবার আগ্রহও মনে জাগে নাই।

চিঠিটার দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। 'আমার ছেলেটি বড় অসুস্থ'--এই কথা কয়টিই আমাকে যাইতে বাধ্য করিল।

রাত্রি বারোটার সময় জমিদার ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম জমিদারের ম্যানেজার জমদগ্নি মিশ্র আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। লোকটার দুশমনের মত চেহারা। মুখে চাপ চাপ গোঁফদাড়ি, যে অংশটুকু রোমহীন তাহাতে বসন্তের দাগ। নাকটা যেন ছোট একটি উই ঢিপি। "নমস্কার ডাক্তার বাবু। আসুন, বসুন। পথে আশা করি কোনও কষ্ট হয় নি—"

"এখানে বসে আর কি হবে? চলুন একেবারে রোগীর ঘরে যাই।"

"আমিই রোগী। আপনার ফি-টা আগে নিয়ে নিন।" তিনি একটা টাকার থলি আমার দিকে আগাইয়া দিলেন। "পাঁচ শ' টাকা আছে ওতে। যদি আরও চান আরও দেব। আমাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে।"

"ব্যাপারটা কি—?"

"একটা খুনের মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছি। দাঙ্গা হয়েছিল, একটা লোক মারা গেছে। বিপক্ষ দলেরা আমাকে আসামী করেছে। উকীল পরামর্শ দিয়েছেন যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে। তাতে লেখা থাকবে, যে তারিখে ওই খুনটা হয়েছে সেই তারিখে আমি কঠিন রোগে আপনার বাসায় আপনার চিকিৎসাধীন ছিলাম—"

বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

জমদগ্নি আমার মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া চাপদাড়িতে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

"ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে গেছে ডাক্তারবাবু। বাঁচান আমাকে দয়া করে।"

"আমাকে মাপ করবেন। আমি ডাক্তার. মিথ্যা সার্টিফিকেট লেখা আমার পেশা নয়। এমনভাবে এত রাত্রে আমাকে ডেকে এনে খুবই অন্যায় করেছেন আপনারা। যাক, আমি চললাম। নমস্কার—"

আমি গমনোন্মুখ হইয়া দ্বারের দিকে ফিরিয়াছি এমন সময় জমদগ্নি বলিলেন, "যাবার আগে একটা কথা শুনে যান. ভবীপুরে চোখ রাঙাবার অধিকার মাত্র একটি লোকেরই আছে, তিনি জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ। তিনি যদি বিরূপ হন তাহলে তাঁর জমিদারিতে আপনি বাস করতে পারবেন না।"

"বেশ, বাস করব না। কালই না পারি দু'একদিনের মধ্যেই আমি অন্যত্র চলে যাব। আপনাদেব এই ব্যবহারের পর আমারই আর এখানে থাকবার প্রবৃত্তি হবে না। আচ্ছা চলি—"

"শুনুন আর একটা কথা। পাঁচ-শ'র জায়গায় যদি পাঁচ হাজার টাকা দিই. তাহলেও আপনি এই উপকারটি করবেন না ?"

"লক্ষ টাকা দিলেও করব না।" বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিলাম, "এখানকার বাস উঠল। জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল। কাল সন্ধ্যার ট্রেনেই চল কোলকাতায় চলে যাই—"

"কেন হঠাৎ ?"

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণীও আমার সহিত একমত হইলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে একটা গরুর গাড়িতে আমার জিনিসপত্র বোঝাই করিতেছি এমন সময় ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে একজন বলিষ্ঠ সুদর্শন যুবক আসিয়া আমার বাসার সামনে অশ্বের গতিরোধ করিলেন। অশ্বের ঘর্মাক্ত কলেবর দেখিয়া বুঝিলাম, বেশ দ্রুতবেগেই তাহাকে আসিতে হইয়াছে।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যুবক সহাস্য মুখে আগাইয়া আসিলেন।

"নমস্কার। আপনিই ডাক্তারবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?"

"আমি বীরেন্দ্রনারায়ণ। আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। এসব কি—"

গরুর গাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

"আমার মালপত্র। আমি আজই চলে যাচ্ছি এখান থেকে—"

"পাগল না কি! আপনাকে কিছুতেই আমি যেতে দেব না। আপনার মতো লোকের সঙ্গ লাভ করা একটা সৌভাগ্য! টাকা খরচ করলে মিথ্যে সার্টিফিকেট অনেক পাওয়া যায়—জমদগ্নি সিভিল সার্জনের কাছ থেকেই সার্টিফিকেট এনেছে, কিন্তু আপনার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। দুপুর রোদে তাই নিজেই ছুটে এলাম। যাওয়া আপনার হবে না, প্লীজ—"

বীরেন্দ্রনারায়ণ হাতজোড় করিলেন।

যাওয়া হইল না।

বন্য মহিষ

রাত বারোটা বেজে গেছে। নীলমণিবাবু তখনও ফেরেন নি। নীলমণি-পত্নী সুলোচনা লোচন দুটি রক্তবর্ণ করে' বসে আছেন রেগে। নীলমণিবাবুর বিধবা বোন মায়াও বসে আছেন একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে। বৌদি দাদার নামে যে সব কটূক্তি করছেন তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু করবার সাহস নেই। বৌদির অনুগ্রহ না থাকলে এ বাড়িতে টেকা সম্ভব নয়।

…ঘড়িতে টং করে' যখন সাড়ে বারোটা বাজল তখন সুলোচনা পুনরায় তিক্তকণ্ঠে মায়াকে বললেন, "কাণ্ডখানা দেখেছ তোমার দাদার। তা-ও যদি বুঝতাম নিজের কাজের জন্যে এত খেটে মরছে তাহলেও বা মানে ছিল। কিন্তু কোথাকার কে হাডহাবাতে মাছের ব্যবসা করবে তার জন্যে ওর ঘুম হচ্ছে না। সারাজীবনটা এই করছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সীমা আছে তো একটা—"

নীলুবাবু ফিরলেন রাত দেড়টার সময় কিছু টাট্‌কা বাটা মাছ নিয়ে। নিদ্রিতা সুলোচনাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, "ওগো, শুনছ, ফার্ষ্টক্লাস বাটা মাছ পেয়ে গেলাম মহলদারের কাছে। ভদ্রলোকের ভাগ্য ভালো, ঝাল করে' ফেল দিকি মাছগুলোর—!"

"এখন, এত রাত্রে? উনুনে আঁচ নেই—তোমার আক্কেলও কি নেই?"

"আঁচ দিয়ে দাও, কতক্ষণ লাগবে! আমি মাছগুলো বেছে দিচ্ছি। মাছ সঙ্গে করে' নিয়ে এলুম, ভদ্রলোককে নিরামিষ খেতে কি দেওয়া যায়!"

মায়া বলল—"আমি সব করে' দিচ্ছি।"

দুই ভাই বোনে মহা উৎসাহে লেগে পড়ল। সুলোচনাকেও লাগতে হ'ল, সে কিন্তু গজগজ করতে লাগল সমানে। যাই হোক, রাত্রি আড়াইটের

সময় উক্ত আগন্তুক ভদ্রলোককে পরিতৃপ্তি সহকারে মাছ-ভাত খাইয়ে নীলুবাবু সত্যই পরিতৃপ্ত হলেন।

যে ঘটনাটা বললাম সেটা একটা উদাহরণ মাত্র। নীলমণিবাবু সারাজীবন ধরে' এই কাজ করে এসেছেন। তিনি সামান্য লোক, স্থানীয় জমিদারের স্টেটে সামান্য গোমস্তার কাজ করেন। কিন্তু তাঁর এমন দিল-দরিয়া স্বভাব যে বিশ্বের যাবতীয় লোককে দু'হাত বাড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা করবার সাহস তাঁর আছে। ঘরের খেয়ে অনেক বুনো মোষ তাড়িয়েছেন তিনি জীবনে। আর সুলোচনাও এ নিয়ে অনেক বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।

একবার অসুস্থ হয়ে কোলকাতা শহরে গিয়ে পড়তে হ'ল নীলুবাবুকে। গ্রামের ডাক্তার তাঁর অসুখ সারাতে পারলেন না। কোলকাতা শহরে নীলুবাবু বড়ই বেকায়দায় পড়ে' গেলেন। এখানে কেউ তাঁকে চেনে না। প্রতি পদক্ষেপে পয়সা দরকার। দিলদরিয়া নীলুবাবু জীবনে বিশেষ কিছু জমাতে পারেন নি। জমিদারের কাছ থেকে শ'দুই টাকা ধার করে' নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি খোলার ঘরে। যে ডাক্তার বাবুটির চিকিৎসায় তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর ফি আট টাকা। তাঁকে বার দুই ডেকেই নীলুবাবুর জিব বেরিয়ে পড়ল। অবশেষে ডাক্তার-বাবুকে নিজের অর্থ-কৃচ্ছ্রতার কথা নিবেদন করলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, "আমার প্রত্যহ আসবার দরকার নেই। সাতদিন পরে পরে আমি আসব। আপনি সকাল বিকেল একটু একটু বেড়াবেন পার্কে গিয়ে। যে ওষুধ দিয়ে গেলাম ওইটেই এখন চলুক—"

নীলুবাবু সুলোচনাকে এবং নিজের একটি অবিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মায়া গ্রামের বাড়িতে ছিল। সবাই চলে এলে ঘরদোর দেখবে কে? আর তাঁর একমাত্র পুত্র জগন্নাথ ছিল বোর্ডিংয়ে। গ্রামে হাইস্কুল ছিল না, তাই তাকে বিদেশ পাঠাতে হয়েছিল। সে যেখানে

ছিল্ সেটাও একটা গ্রাম। শহরে পাঠাবার সামর্থ্য নীলমণির ছিল না।

ডাক্তারের কথা শুনে নীলমণি বললেন—"জগুকে না হয় আসতে লিখি। একা একা বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব এই কোলকাতা শহরে—"

সুলোচনা বললে—"জগুই বা কোলকাতা শহরের কি চেনে। সেও ত কখনও আসে নি—"

"তবু সঙ্গে একটা কেউ থাকলে ভরসা হয়। রাস্তাঘাট দু'দিনেই চিনে নেবে—"

"তাহলে জগুকে লিখে দাও সে যেন কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও তো কোলকাতায় আসে নি। হাওড়া স্টেশনে নেমে এই গলি গলি তস্য গলির ঠিকানা সে কি বার করতে পারবে ?"

"আমি হরেনকে লিখে দিচ্ছি। সেই ওকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

নীলমণিবাবুর বন্ধু হরেন জগুকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এর পরই সমস্যাটা হঠাৎ খুব জটিল হ'য়ে উঠল। নীলমণিবাবু ঠিক করেছিলেন ট্রামে চড়ে' হেদো পর্যন্ত যাবেন, হেদোয় গিয়ে বেড়াবেন। জগুকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন তিনি। ট্রাম স্টপেজের কাছে গিয়ে জগুকে তিনি বললেন, "ট্রামটা এলেই টপ্ করে' উঠে পড়বি। ট্রাম বেশীক্ষণ থামবে না।" ট্রাম যখন এল তখন জগু ঠিক চড়ে' পড়ল, কিন্তু চড়তে পারলেন না নীলমণিবাবু। তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন, ভীড় ঠেলে ওঠা সম্ভবপর হ'ল না তাঁর পক্ষে। তিনি চেঁচিয়ে জগুকে বললেন, পরের স্টপেজে নেমে পড়িস। জগু সে কথা শুনতে পেলে না। ট্রাম যখন কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে থামল তখন নামল সে। কণ্ডাক্টার নামিয়ে দিলে। নেমেই দিশাহারা হয়ে পড়ল বেচারী। কেবল আশা করতে লাগল বাবা হয়তো পরের ট্রামেই এসে পড়বেন। কিন্তু উপর্য্যুপরি তিন চারটে ট্রাম এল, বাবা এলেন না। নীলমণিবাবু আসতেন, কিন্তু তাঁর এমন মাথা ঘুরতে লাগল যে তিনি আর ট্রামে উঠতে সাহসই করলেন না। আস্তে আস্তে বাড়িই ফিরে এলেন। ভাবলেন জগু ঠিক ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু সে এল না। বিকেল গড়িয়ে

সন্ধ্যা হ'ল, ক্রমশ রাত্রি আটটা বাজল তবু জগুর দেখা নেই। কান্না জুড়ে দিলেন সুলোচনা। নীলমণিবাবুও খুব চিন্তিত হলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন আবার। প্রতিবেশী জীবনবাবুর কাছে গেলেন। জীবনবাবুর ফোন ছিল। তিনি ফোন করে' হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিলেন, দু'চারটে থানাতেও খবর দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি বাড়ি যান। যদি কোনও খবর আসে আমি আপনাকে বলে' আসব। চোদ্দ পনর বছরের ছেলে যখন, তখন ভয় নেই। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, ঠিক ফিরে আসবে—হয়তো একটু দেরি হবে, আসবে ঠিক।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মশাই। খবর পেলে দয়া করে জানাবেন আমাকে। আমরা জেগেই থাকব—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে—"

রাত দশটা পর্য্যন্ত জগু এল না। নীলমণিবাবু এবং সুলোচনার মনোভাব অবর্ণনীয়। দুজনেই কাতর ভাবে ভগবান্‌কে ডাকছিলেন। আর কিছু করবার ছিল না।

যা ঘটেছিল তা এই।

জগু প্রায় ঘণ্ট্যখানেক কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাবার জন্যে অপেক্ষা করল। যখন অন্ধকার হ'য়ে এল, তখন তার মনে হল এবার ফেরা উচিত। কিন্তু এখান থেকে হেঁটে সে কি বাড়ি ফিরতে পারবে? সরকার বাই লেন নামটা মনে আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কোনখান থেকে বেরিয়েছে তা তো ঠিক মনে নেই। ট্রামে যাবার উপায়ও বন্ধ, সঙ্গে পয়সা নেই একটিও। টিকিট ছিল না বলেই ট্রাম কণ্ডাক্টার নামিয়ে দিয়েছিল তাকে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিন্তা করল সে অনেকক্ষণ। তারপর একটা বুদ্ধি মাথায় এল। একটা রিক্সায় চড়ে' গেলে কেমন হয়। ওরা অনেক লেনের খবর জানে। বাড়ি গিয়ে ওকে পয়সা দিলেই হবে। একটা রিক্সা-ওলাকে জিজ্ঞেস করলে—"সরকার বাই লেন চেন?"

"খুব চিনি আসুন—"

রিকসা যখন চলতে লাগল তখন জগুর মনে হল সে ঠিক উল্টো দিকে চলছে। বলল সে কথা। কিন্তু রিক্সাওলা ধমকে উঠল—"ঠিক নিয়ে যাচ্ছি বাবু, আপনি বৈসে থাকুন না—"

পাড়াগাঁয়ের ছেলে জগু, চুপ করে রইল। তার মনে হল কোন 'শর্ট কাট্' দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হয়তো। খানিকক্ষণ পরে সে জগুকে নিয়ে যে লেনে ঢুকল তা যে সরকার বাই লেন নয় তা বুঝতে জগুর দেরি হল না। চেহারাই সে রকম নয়।

"এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে—"

"এইতো শাঁখারিটোলা লেন—"

"আমি বললাম সরকার বাই লেনে যাব—"

"সরকার বাই লেন কোথা! তখন বললেন শাঁখারিটোলা, এখন অন্য বাত বলছেন!"

"সরকার বাই লেনে নিয়ে যেতে গোড়াতেই বলেছি।"

"সরকার বাই লেন কোথা আমি জানি না। আপনি আমার ভাড়া দিয়ে দিন, অন্য সোয়ারি করে' যান।"

"আমার কাছে পয়সা নেই যে। আমাকে বাড়ি নিয়ে চল তখন পয়সা দেব।"

"সরকার বাই লেন আমি চিনি না।"

বচসা শুরু হল। কোলকাতার রিকসাওয়ালা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। জগুও নিরুপায়। কথা কাটাকাটি চলতে লাগল। গোলমাল শুনে একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল।

"কি হয়েছে খোকা—"

জগুর তখন চোখে জল। সে সব কথা খুলে বলল ভদ্রলোককে।

"ও, তুমি এই প্রথম কোলকাতা এসেছ বুঝি। কোথায় বাড়ি তোমার?"

"মানসাই। পুর্ণিয়া জেলায়—"

"ও! তোমার বাবার নাম কি?"

"নীলমণি মুখোপাধ্যায়—"

"নীলমণিবাবুর ছেলে তুমি? এস এস।"

ভদ্রলোক রিকশাওলাকে বিদায় করলেন। তারপর বললেন, "সরকার বাই-লেন কোথায় তা আমিও চিনি না। তবে বার করতে পারব আশা করি। তুমি ততক্ষণ একটু কিছু খাও।" ভুণ্ডুর ক্ষিধে পেয়েছিল, সে আর আপত্তি করলে না। প্রচুর খাওয়ালেন ভদ্রলোক। তারপর একটা বই খুলে সরকার বাই-লেনের পাত্তা লাগালেন।

"এইবার চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—"

বিরাট মোটর বার করলেন একটা গ্যারেজ থেকে। দশ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হলেন নীলমণিবাবুর বাসায় রাত্রি সাড়ে দশটায়।

"চিনতে পারেন আমাকে—?"

নীলমণিবাবু চিনতে পারলেন না।

"সেই যে মাছের ব্যবসা উপলক্ষে আপনার কাছে গিয়েছিলাম বছর কয়েক আগে? সেই যে রাত্রে বাটা মাছের ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত খাইয়েছিলেন, মনে নেই?"

নীলমণিবাবুর তখন সব মনে পড়ল।

"আপনার আশীর্বাদে মাছের ব্যবসা করে' ভালই হয়েছে আমার। আপনার সাহায্যেই আমার প্রথম হাতে খ'ড়। যোগাযোগ দেখুন, কতদিন পরে আবার দেখা। এখানে এসেছেন অসুখের চিকিৎসা করাতে? কোন্ ডাক্তার দেখছে—"

ডাক্তার এস. কে. মিত্র—" ,

"আমি কাল নীলরতন সরকারকে নিয়ে আসব। তিনি আমার বাড়ির ডাক্তার। এটি কে? মেয়ে? বা চমৎকার দেখতে তো। বিয়ে হয় নি দেখছি। সুপাত্র আছে হাতে। আমার ভাগ্নে। আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে এখন। আগে সেরে উঠুন—"

নীলমণিবাবু সেরে উঠলেন। তাঁর মেয়েরও বিয়ে হ'য়ে গেল ভদ্রলোকের ভাগ্নের সঙ্গে। নীলমণিবাবু খুব আনন্দিত হলেন অবশ্য, কিন্তু খুব বেশী বিস্মিত বা বিচলিত হলেন না। তাঁর মনে হ'ল যা ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটল, এর

মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর তিনি কিছু দেখতে পেলেন না। মৎস্যব্যবসায়ী যদি এসব না করতেন, তাহলেই বরং তিনি আশ্চর্য হতেন। ভদ্রলোকমাত্রেই তো ভদ্রতা করবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে।

সুলোচনা কিন্তু ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন।

কোলকাতা থেকে ফিরে আসবার প্রায় মাস ছয়েক পরে একদিন নীলমণিবাবু প্রতিবেশী মহাদেববাবুর গাভীটির সেবা করছিলেন, নিজের হাতেই ঘাস দিচ্ছিলেন তাকে। কারণ মহাদেববাবু আসন্নপ্রসবা গাভীটিকে তাঁর কাছে রেখে নিশ্চিন্তমনে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এমন সময়ে জন দুই কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে থানার নূতন দারোগাটি এসে হাজির হলেন।

বললেন, দিন সাতেক আগে দুটি ভদ্রলোক কি আপনার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন?"

"হাঁ। কেন বলুন তো? খদ্দরধারী দুটি ছোকরা—"

"তারা পলিটিকাল আসামী। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে—"

"চলুন—"

হাত ধুয়ে তিনি পুলিশদের অনুগমন করলেন। আর ফিরলেন না। বিচারে তাঁর জেল হ'ল এবং জেলে মৃত্যু হল

পাঁচ বছর পরে বিধবা সুলোচনা এই নিয়ে দুঃখ করছিলেন তাঁর বোনের কাছে।

"চিরকালটা ভাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে গেছেন। কত মানা করতাম, কিন্তু আমার কথা কানে তুলতেন না। কোথা থেকে যে অচেনা দুটো লোক এল। আর বাড়িতে কোন লোক এলে তো ওঁর জ্ঞান থাকত না, একেবারে অস্থির হয়ে উঠতেন। কত মানা করতাম আমি। এখন হাতে পয়সা নেই, জগুরও চাকরি হয় নি—"

হঠাৎ জগন্নাথ উত্তেজিত হ'য়ে এসে ঢুকল।

"মা, আমার চাকরি হয়ে গেল। অনেক ভালো ভালো ক্যাণ্ডিডেট ছিল। কিন্তু আমারই হয়ে গেল। কি করে' হ'ল জান? সেই যে দুটি লোক একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল যার জন্যে বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, তাদেরই একজন মিনিষ্টার এখন। আমার পরিচয় শুনে বললেন—"ও তুমি নীলমণিবাবুর ছেলে! তোমাকে নিশ্চয়ই নেব। তোমার বাবা সেদিন রাত্রে আশ্রয় না দিলে হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত আমার। বস, বস—।" খুব আদর যত্ন করলেন। তারপর বললেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও, তোমার চাকরি হয়ে যাবে।"

সুলোচনা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

নীলকণ্ঠ

নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় যে গুণী লোক এর একটা অকাট্য প্রমাণ আমি এসেই পেয়েছিলাম। আমার এক মাস্টার মশাই আমাকে বলেছিলেন যদি কোনও শহরে গিয়ে কোনও লোকের নামে নিন্দা শোন, তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে আলাপ কোরো, জেনো লোকটির মধ্যে বস্তু আছে কিছু। বাঙালী জাতটা সমঝদার জাত, শ্রী-র স্বরূপ চিনতে দেরি হয় না তাদের, কিন্তু সেই শ্রী পর-শ্রী হলে বেচারারা কাতর হয়ে পড়ে একটু। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে মর্যাদা দেয় খুব, সেলামই করে, কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে। বাঙালীর মুখনিঃসৃত নিন্দাটা প্রশংসারই নামান্তর জেন। বাজে লোকের নিন্দা তারা করে না। মাষ্টার মশাই-এর এ উপদেশটা যে নিতান্ত বাজে নয় তার প্রমাণ একাধিকবার পেয়েছি।

নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে আলাপ করা অবশ্য শক্ত একটু। তিনি থাকেন শহর থেকে বেশ একটু দূরে। তাঁর বাড়ির সিংহ দরজাটি লৌহনির্মিত এবং সেটি প্রায় সর্বদাই বন্ধ থাকে। সেটি খুলতে হলে গলার বেশ জোর থাকা চাই। কারণ যে ভৃত্য সেটি খোলে সম্ভবত সে একটু বধির, থাকেও সে বাড়ির ভিতর দিকে। উচ্চকণ্ঠে অনেক ডাকাডাকি না করলে তাকে কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করা যায় না। তাছাড়া কুকুর আছে একটি, সেটি আবার কর্তব্য বিষয়ে একটু বেশি সচেতন। গেটের কাছে কেউ এসে দাঁড়ালেই হল, তার দাঁড়ানোর সন্তোষজনক হেতুনির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত সে তারস্বরে চীৎকার করে। সম্ভবত তার চীৎকারেই নীলকণ্ঠবাবুর অর্ধবধির দ্বারপাল বুঝতে পারে যে কেউ এসেছে।

এতরকম বাধা থাকা সত্ত্বেও নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল ভদ্রলোককে। সাহিত্যবিষয়ে দু'চারটি মাত্র কথা বলেছিলেন। একটি কথা এখনও মনে আছে।

বলেছিলেন, "বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি ?"

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলাম না। "কি ধরণের বেকার-সমস্যা! আমাদের দেশে সাহিত্যিক মাত্রেই বোধ হয় বেকার—"

"না, তা ঠিক নয়। যাঁরা কোনরকম সার্থক সৃষ্টি করেন না, অথচ যাঁরা লেখেন হয় পেটের দায়ে, না হয় মানসিক কণ্ডূয়ন নিবৃত্তির জন্য তাঁদেরই আমি বেকার বলছি। এঁরা প্রায়ই দেখবেন সমালোচক হন। এঁদের চেহারা দেখিনি কারও, কিন্তু আমার মনে হয় এঁরা সকলেই বোধ হয় রোগা। সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের নিয়ে এঁরা যে-রকম ভাবনা ভাবেন, তাতে মনে হয় রাত্রে ঘুমই হয় না হয়তো অনেকের। বাংলাসাহিত্যের এই গার্জেনদের জটিল ভাষায় লেখা প্রবন্ধগুলো পড়লেই বুঝতে পারি বাংলা-সাহিত্যের প্রাঙ্গনেও বেকারের দল ভীড় করছে। ওদের প্রবন্ধ পড়লে আমার একজনকে মনে পড়ে।"—বলে' তিনি স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন, "মনে পড়ে নিধু পাগলাকে। নিধু পাগলা গাছেদের লক্ষ্য ক'রে হাত-পা নেড়ে নেড়ে ক্রমাগত উপদেশ দিত। একবার দেখেছিলাম একটা ফলন্ত কাঁঠাল গাছকে লক্ষ্য করে নিধু বলছে—একটিও কাঁঠাল ভাল হয়নি বাপু তোমার। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়, যাক আর গুণে সময় নষ্ট করতে চাই না, অনেক কাঁঠাল ফলিয়েছ মানছি, কিন্তু একটিও ভাল ফল হয়নি। আমাদের অনেক সমালোচকদের সেই দশা। এঁদের কেউ মানে না কিন্তু এঁরা সব মোড়ল সেজে বসেছেন—"

গুরুগম্ভীর সমালোচকদের তিনি নিধু পাগলার সঙ্গে তুলনা করলেন শুনে বেশ মজা লেগেছিল সেদিন। লোকটিকে কিন্তু আরও ভাল লেগেছিল। আমি যখন গেলাম তখন তিনি খুব ধুমধাম ক'রে ঘরে ধুনো দিচ্ছিলেন।

চতুর্দিক গন্ধে ও ধূমে পরিপূর্ণ। বড় বড় চারটে পেতলের ধুনুচিতে জ্বলছিল ধুনো, গুগ্‌গুল, অগুরু আর চন্দন, কিছুদূরে বনবন ক'রে ঘুরছিল বড় ইলেকট্রিক ফ্যান একখানা, দেখে মনে হল ধুনুচির আগুন যাতে নিবে না যায় তাই এই ব্যবস্থা।

লোকটি প্রৌঢ়, ঈষৎ স্থূলকায়। মুখে কিন্তু শিশুর সারল্য। মন মনে হল আরও কচি।

আমাকে বললেন, "কিসমিস খাবেন? অনেকদিন কিসমিস খাইনি, তাই কিছু আনিয়েছিলাম কাল।" নিজেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। একটু পরেই একটা শাদা পাথরের রেকাবি ক'রে প্রচুর কিসমিস এনে বললেন, "খান। একটু গোলাপ জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। গোলাপ জলের গন্ধ ভাল লাগে তো আপনার। এই সবই হল আসল কাব্য! আসুন—"

প্রচুর কিসমিস খেয়েছিলাম সেদিন।

"আসুন, আর একটা মজাব জিনিষ দেখাই আপনাকে। টবের উপর ওটা কি বলুন তো, চেনেন?"

দেখলাম লতা একটা. ঠিক চিনতে পারলাম না। একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ ক'রে রইলাম।

"অপ্রস্তুত হবার দরকার নেই। এদেশে কেউ কিছু চেনে না। আমিও চিনতাম না কিছুদিন আগে। ওটা লজ্জাবতী লতা। কিন্তু এখন আর লজ্জা নেই, বেহায়া হয়ে গেছে. ছুঁয়ে দেখুন—"

ছুঁয়ে দেখলাম, বিশেষ কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না।

"আগে ছোঁওয়ামাত্র পাতাগুলো মুড়ে যেত। এখন ক্রমাগত ছুঁয়ে ছুঁয়ে লজ্জাহীনা করে তুলেছি ওকে।"

কেমন যেন অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর একটু হেসে একটু শিস্ দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই দেওয়ালের দিকে ভুরু কুঁচকে চাইলেন। দেখলাম সবুজ পোকা একটা চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"চেনেন ওটাকে?"

"না।"

"কাচপোকা। আমার স্ত্রীর খুব সখ ছিল কাচপোকার টিপ পরবার। অনেক টিপ পরিয়েছি তাকে। সে এখন নেই. পোকাগুলোকে দেখলে তার কথা মনে পড়ে। ভাবি ভাগ্যে তার টিপ পরার সখ ছিল তাই পোকাগুলো আর পোকা নেই, সবুজ স্মৃতি হয়ে গেছে আমার চোখে—"

আরও হয়তো আলাপ চলত কিছুক্ষণ। কিন্তু একটা ছোঁড়া চাকর এসে বললে, "খোকাবাবু ডাকছে আপনাকে ওপরে—"

"এই রে মাটি করেছে! আপনি এসেছেন টের পেয়ে গেছে বোধহয়। আমার কাছে কোনও লোক আসে, এটা ও পছন্দ করেনা। আচ্ছা, চললুম—" নমস্কার করে দ্রুতপদে চলে গেলেন। মনে হল মনিবের ডাকে চাকর ছুটে গেল বুঝি।

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম নীলকণ্ঠবাবুকে দেখে সেদিন। এত বড় বিদ্বান লোক, ইয়োরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু দিন কাটিয়েছেন, ফরাসী, জার্মাণী, ইংরেজি ভাষায় ভাল ভাল বইও রচনা করেছেন অনেক—লোকটি কিন্তু একেবারে ছেলেমানুষ যেন।

ওঁর নিন্দায় কিন্তু সকলেই শতমুখ। লোকটি নাকি অহঙ্কারী, স্বভাব-চরিত্রও নাকি ভালো নয়, ওঁর বইও নাকি ওঁর লেখা নয়, বিদেশে কোন মেমসাহেবের প্রেমে পড়েছিলেন, সেই নাকি সব বই ওঁর নামে লিখে দিয়েছিল, বড়লোকের ছেলে বলেই সব মানিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি অনেক রকম কথাই ওঁর বিরুদ্ধে শুনেছিলাম। ওঁর ছেলেটি এম-এ'তে ফার্স্ট হয়েছিল, কিন্তু লোকে বলত তা-ও নাকি অনেক রকম তদ্বির করার ফলে হয়েছে। টাকা ঢাললে সবই সম্ভব আজকাল।

যাইহোক যে প্রসঙ্গে নীলকণ্ঠবাবুর নামটা মনে পড়ল, সেই প্রসঙ্গটা এবার বলি। শহরে একটি ছোটখাটো লাইব্রেরি ছিল। ছেলে ছোকরাদের শখ

হল সেই লাইব্রেরিতে একটি বাংলাসাহিত্য সভা স্থাপন করবার। আমাদের শখ আছে—কিন্তু সামর্থ্যে কুলোয় না। শখ মেটাবার জন্যেও ভিক্ষাপাত্র হাতে করে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়, ঘুরেও সব সময় আশানুরূপ অর্থ জোটেনা। একজন উপদেশ দিলেন, 'এখানে যে নূতন কমিশনার সাহেব এসেছেন (তখনও আমরা স্বাধীনতা পাইনি) তিনি একজন সাহিত্যামোদী ব্যক্তি, তিনি ইচ্ছে করলে গবর্ণমেণ্টের তহবিল থেকে কিছু সাহায্য করতে পারেন।' কয়েকজন মিলে কমিশনার সাহেবের কাছে গেলেন। কমিশনার সব শুনে বললেন, "শুনেছি নীলকণ্ঠ ব্যানার্জি এখানে থাকেন। আমি তাঁর সঙ্গে অক্সফোর্ডে পড়তাম। তিনি যদি তোমাদের সভার ভার নেন তাহলে আমি শ'পাঁচেক টাকা দেব তোমাদের।"

নীলকণ্ঠ ব্যানার্জির উপর কেউ প্রসন্ন নন, কিন্তু স্বয়ং কমিশনার যখন তাঁর উপর প্রসন্ন তখন আর কথা কি। লোকটাকে দলে টানলে যদি শ'পাঁচেক টাকা পাওয়া যায় মন্দ কি! তাকেই না হয় সাহিত্যসভার সভাপতিই করে' দেওয়া যাক। উপায় কি তাছাড়া। কথা ছিল শহরের একজন বড় উকিলকে সভাপতি করা হবে। তিনি নগদ পাঁচ টাকা চাঁদাও দিয়েছিলেন। কেবল মাসিকপত্রের পাতা উল্টে সাহিত্যিক হতে চান যাঁরা তাঁদের মধ্যে একজন উক্ত উকিলকে ভোটে হারিয়ে দিয়ে নিজেই সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু সব ভেস্তে গেল। ওই অহঙ্কারী লোকটারই দ্বারস্থ হতে হল শেষকালে সবাইকে।

নীলকণ্ঠবাবু রাজি হলেন না। বললেন, "আমি নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি যেতে পারব না। আমাকে মাপ করুন আপনারা। যদি কিছু চাঁদা চান, দিয়ে দিচ্ছি—"

লোকটার স্পর্ধা দেখে মনে মনে সবাই জ্বলে গেলেন কিন্তু মুখে খোশামোদ করে' যেতে হল। প্রথমত কমিশনার সাহেব, দ্বিতীয়ত পাঁচশ' টাকা। কমিশনার সাহেবের একজন ক্লার্ক (যাঁর পাকা মাথা থেকে বিলেতের মেম-সাহেবের কাহিনীটা বেরিয়েছিল) গললগ্নীকৃতবাসে শেষকালে বলে' বসলেন, "আপনি যদি এ সভায় না যোগ দেন, তাহলে আমার চাকরি যাবে। সাহেব

যখন গোঁ ধরেছে তখন আর উপায় নেই। আপনি না গেলে একটি পয়সা তো দেবেই না আমাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠবে। আপনি দয়া করুন। অন্তত যেদিন সভার উদ্বোধন হবে সেদিনটি আপনি সভাপতি হোন—"

নীলকণ্ঠবাবু আর আপত্তি করতে পারলেন না। সভার দিন স্থির হল। নীলকণ্ঠবাবু প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ঠিক পাঁচটার সময় সভায় উপস্থিত হবেন।

কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। পাঁচটা, সওয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল তবু নীলকণ্ঠবাবুর দেখা নেই।

সভায় লোক গিসগিস করছে, মাঝে মাঝে হাত-তালি, শিস-দেওয়া যথারীতি চলছে, কলরবে চীৎকারে কান পাতবার উপায় নেই, সভার উদ্যোক্তারা এদিক ওদিকে ছুটোছুটি করছেন কিন্তু নীলকণ্ঠবাবুর দেখা নেই। কাছে-পিঠে বাড়ি হলে কেউ ডাকতে যেত, কিন্তু তাঁর বাড়ি শহর থেকে বেশ দূরে, তাছাড়া তাঁর লোহার গেট, কালা চাকর আর কুকুরের কথা ভেবে যেতেও উৎসাহ হচ্ছিল না কারো, একটা বাইক জোগাড় করে' আমিই যাব ভাবছিলাম এমন সময় তাঁর মোটরটা দেখা গেল।

সভায় যথারীতি সম্বর্ধনা-সঙ্গীত, অঙ্গভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি, গীত-বিতান হারমোনিয়মের উপর রেখে নাকিসুরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রভৃতি প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একে একে হল। সভাপতি তাঁর ভাষণে শেষকালে বললেন যে, সভায় ঠিক সময় আসতে পারেননি বলে' তিনি দুঃখিত। তাঁর বাড়িতে একজন অতিথি কিছুদিন ছিলেন, তিনি হঠাৎ চলে গেলেন, তাঁর বিদায়কালীন ব্যবস্থা করতে গিয়ে বিলম্ব হয়ে গেল একটু। সবাই যেন তাঁকে ক্ষমা করেন। তারপর সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন।

সভা শেষ হয়ে যাবার পর জানা গেল তাঁর একমাত্র ছেলেটি ঠিক সাড়ে চারটের সময় হার্টফেল করে' মারা গেছে। সে নাকি অনেকদিন থেকে হৃদ্‌রোগে ভুগছিল।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে

উমাশঙ্করবাবু বিনয়কে যখন দেখিয়াছিলেন তখন তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন নাই। পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা ছিল না। বিনয় ট্রেণের একটি কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া প্ল্যাটফর্মের উপর কাহার সহিত যেন কথা কহিতেছিল, উমাশঙ্করের বন্ধু তিনকড়ি দেখাইয়া দিয়াছিল, "যে ছেলেটির কথা তোমাকে বলছিলাম ওই দেখ সেই ছেলেটি। চমৎকার দেখতে নয়?"

তিনকড়িও বিনয়কে ভাল করিয়া চিনিতেন না। তিনিও তাঁহার বন্ধু হরপ্রসাদের নিকট সন্ধানটি পাইয়াছিলেন এবং কলিকাতার ট্রামে তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। দৈবাৎ আজ ট্রেণে আবার তিনি বিনয়কে দেখিতে পাইলেন এবং উমাশঙ্করকে দেখাইয়া দিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত উমাশঙ্করের কন্যা প্রতিমার জন্য তিনি সৎপাত্রের খোঁজে ছিলেন। হরপ্রসাদ তাঁহাকে বিনয়ের সন্ধান দিয়াছিলেন।

উমাশঙ্কর এবং তিনকড়ি ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন অন্য প্রয়োজনে। অপ্রত্যাশিতভাবে বিনয়ের দেখা পাওয়া গেল। বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা। উমাশঙ্করের খুব পছন্দ হইয়া গেল। কিন্তু তাহাকে ভালো করিয়া দেখিবার (শুদ্ধ বাংলায় যাহাকে পর্যবেক্ষণ করা বলে) সুযোগ পাওয়া গেল না। ট্রেণ ছাড়িয়া গেল। উমাশঙ্করবাবু ইহার পরেও বিনয়কে দেখিবার সুযোগ পান নাই। বিনয় থাকে বেরিলিতে, উমাশঙ্করবাবু থাকেন বর্দ্ধমানে। বিনয়কে দেখিতে হইলে অনেকগুলি গাঁটের পয়সা খরচ করিতে হয়। প্রয়োজন বুঝিলে উমাশঙ্করবাবু হয়তো তাহা করিতেন, কিন্তু তিনি প্রয়োজনই বোধ করিলেন না। পাত্রের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিবার জন্য কেহই বিশেষ ব্যগ্র হয় না, পাত্রী হইলে বরং কথা ছিল। সুতরাং বিনয়কে ট্রেণের কামরায় একনজর দেখিয়াই উমাশঙ্কর সন্তুষ্ট রহিলেন।

বিবাহের কথাবার্তা কিন্তু চলিতে লাগিল। তিনকড়ির সঙ্গেই একদা উমাশঙ্কর কলিকাতানিবাসী হরপ্রসাদের দ্বারস্থ হইলেন। হরপ্রসাদ বলিলেন, "বিনয়ের বাবাকে আমি চিনতাম। এক আপিসেই আমরা কাজ করতাম সিমলায়। তিনি অবশ্য মারা গেছেন, বিনয়ের মা-ও নেই। কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে ওদের, ছেলেটিও ভালো। বিয়ের মালিক ও নিজেই। লিখে দেখি ও যদি রাজী হয়। আপনি ছেলেটিকে দেখেছেন তো—"

"দেখেছি, খুব পছন্দ হয়েছে আমার।"

"ওর আর একটা ঝোঁক আছে। ও লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে চায়। আপনার মেয়ে লেখাপড়া করেছে কতদূর?"

"বি-এ পাশ করেছে। বাংলায় এম-এ পড়ছে।"

"বাঃ, তাহলে তো ভালই। আমি তাকে চিঠি লিখছি, আপনিও লিখুন. ঠিকানা দিচ্ছি আপনাকে। ছেলেটিকে আপনি দেখেছেন তো ভাল করে, না দেখে থাকেন তো গিয়ে দেখে আসুন।"

"না, আর দেখবার দরকার নেই, যতটুকু দেখেছি তাই যথেষ্ট।"

"তাহলে বিবাহের প্রস্তাব করে চিঠি লিখুন, আমিও লিখছি, আমার মনে হয় হয়ে যাবে। বিনয় আদর্শবাদী ছেলে, পণটন-ও আপনার লাগবে না তেমন।"

হরপ্রসাদ আসল কথাটি জানিতেন, কিন্তু ভাঙ্গিলেন না। বন্ধুপুত্র বিনয়ের একটি ভালো বিবাহ দিবার জন্য তিনিও বহুদিন হইতে চেষ্টি- ছিলেন।

…চিঠিপত্র চলিতে লাগিল। বিনয়ের পত্র পাইয়া উমাশঙ্কর অবাক হইয়া গেলেন। এ যুগে এমনটা হওয়া যে সম্ভব তাহা তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। বিনয় মেয়ে পর্যন্ত দেখিতে চাহিল না। লিখিয়াছে 'আপনার কন্যা বি-এ পাশ করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে গেলে সে হয়তো অপমানিত বোধ করিবে। ভাবী বধূকে অপমান করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আপনি তো লিখিয়াছেনই

মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী, ইহার পর মেয়ে দেখিতে যাওয়ার অর্থ আপনাকে অবিশ্বাস করা। তাহা করা কি উচিত? এই সব ভাবিয়া স্থির করিলাম মেয়ে দেখিতে যাইব না।'

উমাশঙ্কর অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সত্যই এতটা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার আশা হইল এতদিনে বোধহয় মেয়েটার সদ্গতি হইবে। একমাত্র মেয়ে, উমাশঙ্করের অবস্থাও নিতান্ত খারাপ নয়, তবু তিনি কন্যার জন্য সৎপাত্র জুটাইতে পারেন নাই। যখনকার কথা বলিতেছি তখন ইংরেজের আমোল, স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিযুগ চলিতেছে, বাঙ্গলার নব জাগ্রত যৌবনকে নিষ্পিস্ট করিয়া দিবার জন্য প্রতাপশালী ইংরেজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি যুবক-যুবতীর পিছনে স্পাই ঘুরিতেছে। যাঁহারা সরকারী চাকরি করেন, অথবা যাঁহারা ইংরেজের পদলেহী তাঁহারা বোমারুদের সংশ্রব যথাসাধ্য এড়াইয়া চলেন, সুযোগ পাইলে কেহ কেহ আবার তাহাদের ধরাইয়াও দেন। তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল একদল লোকও অবশ্য ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তি করিতেন, কেহ কেহ সাহয্যও করিতেন। উমাশঙ্কর এই শেষোক্ত দলের লোক। গোপনে গোপনে তিনি বোমারুদের অর্থ সাহায্য করিতেন, মাঝে মাঝে দুই একজন পলাতক বোমারুকে আশ্রয়ও দিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃহীন কন্যা নন্দিনীরও অনুরূপ মনোভাব ছিল, শোনা যায় বাক্সের ভিতর সে ক্ষুদিরাম, কানাই, যতীন, উল্লাসকরের ছবিও নাকি লুকাইয়া রাখিত। ব্যাপারটা কিন্তু বেশী দিন চাপা থাকে নাই, অনেকেই জানিয়া ফেলিয়াছিল যে উমাশঙ্কর বোমারুদের প্রতি সহানুভূতিশীল। চাকুরিয়া এবং পদলেহীরা তাঁহাকে তাই এড়াইয়া চলিত। কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করাও তাই তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। যে সম্প্রদায় হইতে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহ করেন, সে সম্প্রদায়ের অধিকাংশই চাকুরিজীবী। তাহারা যেই শুনিল যে উমাশঙ্করবাবুর সহিত টেরারিস্টদের সম্পর্ক আছে, অমনি তাহারা পিছাইয়া গেল। ওই বাড়ীতে বিবাহ দিয়া কে পুলিশের কবলে পড়িতে যাইবে! পিতৃনাম স্মরণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে লাগিল।

উমাশঙ্করবাবু সত্যই বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনকড়ির সহায়তায় বিনয়ের নাগাল পাইয়া তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। বিনয় নামটাও তাঁহার খুব পছন্দ হইয়া গেল। বিপ্লবীদের ইতিহাসে 'বিনয়' নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। বলা বাহুল্য, নন্দিনীও মনে মনে খুব খুসী হইয়াছিল। বিনয়ের চিঠি পড়িয়া তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। উমাশঙ্করবাবু তো আনন্দের সপ্তম স্বর্গে উত্তীর্ণ হইলেন।

স্বর্গ হইতে কিন্তু পতন হইল। বিবাহের দিন বিনয় যখন ট্রেণ হইতে নামিল তখন উমাশঙ্করবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল। তিনি এবং পাড়ার আর একজন মাতব্বর লোক মোটর লইয়া বিনয়কে ষ্টেশন হইতে আনিতে গিয়াছিলেন, দেখিলেন বিনয় ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে ট্রেন হইতে নামিল। বিনয় খোঁড়া। ভয়ঙ্কর খোঁড়া, লাঠির সাহায্য ছাড়া চলিতেই পারে না। সঙ্গে বরযাত্রী একজনও নাই। সে একাই আসিয়াছে। উমাশঙ্করবাবু বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে মাতব্বরটি সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনি একবার উমাশঙ্করের দিকে চাহিয়া উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটটি চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল, চক্ষুদ্বয় জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। কিন্তু স্টেশনে ইহা লইয়া হুজ্জৎ করা শোভন নহে। খোঁড়া বিনয়কেই মোটরে চড়াইয়া তাঁহারা বর ও বরযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িটিতে লইয়া গেলেন। মাতব্বর ব্যক্তিটি যাইবার পূর্বে আড়ালে উমাশঙ্করকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, "খাইয়ে-দাইয়ে বিদেয় করে দাও। ব্যাটাচ্ছেলে, জোচ্চোর !..."

"সেটা কি ভালো হবে।"

"তোমার একমাত্র মেয়েকে খোঁড়া পাত্রের হাতে সম্প্রদান করবে না কি ! যারা ঘটক তারা কোথায় ?"

"তাদের তো আসবার কথা ছিল, কিন্তু কেউ এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি।—"

"সব যোগসাজস্, ষড়যন্ত্র, বুঝতে পারছ না, দূর করে দাও ব্যাটাকে—" মোটরে চড়িয়া মাতব্বর ব্যক্তি চলিয়া গেলেন। মোটরটি তাঁহারই। উমাশঙ্কর ক্ষণকাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে বিনয়কে জিজ্ঞাসা করাই সমীচীন মনে করিলেন। গত্যন্তরও ছিল না।

"আচ্ছা, তোমার পা এমনভাবে খোঁড়া হয়ে গেল কি করে?"

"হাঁটুতে খুব চোট লেগেছিল একবার, বছর পাঁচেক আগে।"

"কি করে চোট লাগল, খেলতে গিয়ে কি?"

"মাপ করবেন, তা আমি বলতে পারব না।"

"কেন বলতে বাধাটা কি?"

"বলতে বাধা আছে।"

এ উত্তর শুনিয়া উমাশঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। গোপন করিবার অর্থ কি? বিশেষত, হবু-শ্বশুরের কাছে! উমাশঙ্কর কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নটি করিলেন।

"তোমার সঙ্গে একজনও বরযাত্রী আসেনি কেন?"

"দু'চারজন আসতে চেয়েছিল কিন্তু ইচ্ছে করেই আনি নি। আমার হাঁটুতে কি হয়েছিল সেটা দু'একজন জানে, তাদের মুখ থেকে কথাটা হয়তো প্রকাশ হয়ে যাবে এই ভয়ে তাদের এড়িয়ে একলাই চলে এসেছি।"

"হরপ্রসাদবাবু কি জানেন ব্যাপারটা?"

"জানেন। কিন্তু তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ব্যাপারটা কোথাও ফাঁস করবেন না।"

বিনয় হাসি মুখে উমাশঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উমাশঙ্কর আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না। তাঁহারও সন্দেহ হইল ইহার অন্তরালে কোনও ভীষণ ষড়যন্ত্র প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

পাড়ায় একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। যাঁহারা কোনও কালেই উমাশঙ্করের হিতৈষী ছিলেন না তাঁহারা সহসা অত্যন্ত হিতৈষী হইয়া পড়িলেন। সকলেই লাঠি উঁচাইয়া বলিল, "ব্যাটা জোচ্চোরকে মেরে দূর করে দাও—।"

উমাশঙ্করের অনেক আত্মীয়স্বজন বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও সকলে এ বিষয়ে একমত ছিলেন। উমাশঙ্করের বিষয়টি হস্তগত করিবার আশায় পাড়ার লক্ষ্মীকান্তবাবু তাঁহার নন্-ম্যাট্রিক পুত্রটির সহিত নন্দিনীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একদা বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল। তিনি পুনরায় প্রস্তাবটি করিলেন।

"ওই খোঁড়া অজ্ঞাতকুলশীল লোকটার হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে আমার গদাইয়ের হাতে দেওয়া শতগুণে ভাল। ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে। গদাই আজকাল কন্ট্রাক্টরি করে' বেশ রোজগার করছে—"

উমাশঙ্কর হাঁ-না কিছুই বলিলেন না। সত্যই তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। উমাশঙ্করের দূরসম্পর্কীয় যে মাতুলটি আসিয়াছিলেন তিনিই অবশেষে বলিলেন, "ওর হাতে আমরা মেয়ে দেব না। তোমার বলতে যদি চক্ষুলজ্জা হয়, আমিই বলে আসছি গিয়ে।"

তিনি গিয়া দেখিলেন, বিনয় নাই।

চাকরটি মুচকি হাসিয়া বলিল, "তিনি নিজেই গাড়ি ডাকিয়ে স্টেশনে চলে গেছেন।"

ইহার খানিকক্ষণ পরেই কলিকাতা হইতে হরপ্রসাদ এবং তিনকড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কি একটা বিশেষ কাজে আটকাইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সময় মতো উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে যে ঘটনা ঘটিল তাহাকে নাটকীয় আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হইবে না। দৃশ্যটা এইরূপ। উমাশঙ্কর, উমাশঙ্করের মাতুল এবং তিনকড়ি তিনজনেই করজোড়ে বিনয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, বিনয় স্মিতমুখে তাঁহাদের বক্তব্য শুনিতেছেন।

উমাশঙ্কর বলিতেছিলেন, "আমাদের অপরাধ নিও না বাবা, আমরা তো জানতাম না, হরপ্রসাদবাবুর কাছে সব শুনলাম। রাত তিনটের সময় আর একটা লগ্ন আছে, চল।"

বিনয় প্রশ্ন করিল, "আপনার মেয়ের মত নিয়েছেন ?"

মাতুল বলিলেন, "সে বলছে আপনার সঙ্গে যদি বিয়ে না হয় তাহলে সে আর বিয়েই করবে না।"

তিনকড়ি বলিলেন, "উমাশঙ্করবাবু মেয়ের বাপ, তাঁর মনোভাবটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারবেন, আপনি শিক্ষিত লোক আপনাকে বেশী বলা বৃথা। চলুন—"

বিনয় বলিল, "যেতে পারি একটি সর্তে। তামা তুলসী গঙ্গাজল আর গীতা স্পর্শ করে আপনাদের শপথ করতে হবে যে যা শুনেছেন তা জীবনে কখনও প্রকাশ করবেন না।"

তিনজনেই সমস্বরেই উত্তর দিলেন—"আমাদের কিছু আপত্তি নেই।"

বিনয় খ্যাংচাইতে খ্যাংচাইতে গিয়া পুনরায় মোটরে উঠিল।

হরপ্রসাদবাবু পরিস্থিতির গুরুত্ব দেখিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে বিনয় একদা একটি বিপ্লবী দলে ছিল। একবার সেই দল স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। পুলিশের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে তাহার হাঁটুতে গুলি লাগে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারে নাই, তাহার দলের লোকেরা তাহাকে কাঁধে করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। দলের কেহই ধরা পড়ে নাই। তাহাদের মধ্যে দুই চারিজন এখন চাকরিও করিতেছে। কথাটা প্রকাশ হইয়া গেলে তাহাদের চাকরি থাকিবে না। তাই বিনয়ের এই সাবধানতা।

নির্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

পালোয়ান

আপনারা আজকালকার ছেলেদের যত বোকা মনে করেন তত বোকা তারা নয়। তাদের প্যাণ্ট পরা, তাদের গোঁফ ছাঁটা, তাদের পরীক্ষায় ফেল করা, তাদের গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো প্রভৃতি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামিয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করেন তাঁদের কাছে সবিনয়ে আমি একটি নিবেদন কেবল করব। তাঁরা আজকালকার ছেলেদের চেনেন না, চিনলে অতটা হতাশ হয়তো হতেন না। ইংরেজরা প্রথমে যখন এদেশে এসেছিলেন তখন আমাদের দেশের যে কি দুর্দ্দশা ছিল তা ইতিহাসের পাতা ওলটালেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যে কত রকম কসরৎ করে, কত রকম ইংরেজী অভিধান মুখস্থ করে, কত রকম কায়দায় ইংরেজদের সেলাম করে, তাদের বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করে, তাদের সভ্যতার নকল করে যে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন তা-ও ইতিহাসের পাতা ওলটালেই জানতে পারবেন। আপনারা আড্ডায়, খবরের কাগজে, সভায় যাদের নিন্দা পঞ্চমুখে করেও শেষ করতে পারছেন না আমি সবিনয়ে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তারাও পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক মহাজনদেরই আধুনিকতম বংশধর। জীব জগতে কোথাও যা হয় না, মানুষের বেলাতেই বা তা হবে কেন? আম গাছে আমই ফলবে, আমড়া নয়। ফলছেও, বাঙালীর ছেলের ঘিলু এখনও গোবর হয়ে যায়নি, কেবল রাজনীতির ছকটা একটু বদলে গেছে বলে বেচারা চাকরি পাচ্ছে না। কিন্তু তবু তারা দমে' যায়নি, তার প্রমাণ চোখ মেললেই দেখতে পাবেন। কোনও সিনেমা, কোনও ফুটবল ম্যাচ কোনও নাচ-গানের জলসা, কোনও সাহিত্যের মজলিশ, কোন রাজনৈতিক সভা তারা বাদ দেয় না। তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখুন, মনে হবে কি যে এই ছোকরা বেকার? হবে না। তারা তাদের বাইরের মর্য্যাদাটুকু অন্তত

অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পালোয়ান পাকড়াশীর কাণ্ড দেখে সত্যি তাই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি।

বার চারেক ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করে পালোয়ান আবিষ্কার করলে যে, সে চৌকোণা চৌকষ লোক, ম্যাট্রিকুলেশনের গোল গর্ত্তে তার পক্ষে ঢোকা অসম্ভব। বাবাকে সে কথা বোঝাতেও চেষ্টা করলে, বাবা কিন্তু সেকেলে মানুষ, বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে জুতো নিয়ে তাড়া করে গেলেন। এরকম অবুঝ লোকের অধীনে বাস করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবার ছেলে পালোয়ান নয়। পালোয়ান পালাল একদিন বাড়ি থেকে। ছেলে পালিয়ে যাওয়া নিয়ে অনেকেই দেখি আজকাল নানারকম মন্তব্য করে' আড্ডায় আসর গুলজার করেন। একটা কথা তাঁরা ভুলে যান, বুদ্ধদেবও বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেকালে খবরের কাগজ থাকলে সম্ভবত রাজা শুদ্ধোধনও 'নিরুদ্দেশ' শিরোনামা দিয়ে কাগজের সাহায্যে ছেলের খোঁজ করতেন।

পলাতক পালোয়ান পাকড়াশীও সিদ্ধার্থের মতো স্বকীয় ভাবনা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভ করেছিল। যে সিদ্ধিলাভের জন্য বাঙালীর ছেলে নোটবুক মুখস্থ করে' দলে দলে পরীক্ষা পাশ করছে সেই সিদ্ধিই লাভ করেছিল সে।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে গঙ্গাই সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী, কিন্তু এ যুগে আমরা জেনেছি ওটা বাজে কথা। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী যদি কিছু থাকে তার নাম রাজনীতি। পালোয়ান বাড়ি থেকে পালিয়ে রাজনীতি তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। সিদ্ধ-সমুদ্র-মুখিনী এ তরঙ্গিনীর বৈশিষ্ট্য অন্য তরঙ্গিনীর মতোই। এর তরঙ্গে গা ভাসালেও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা সম্ভবপর হয় না। প্রগতিশীলা এ তরঙ্গিনীর প্রবাহে একবার পড়লে নানা ঘাটের জল খেতে হয়।

পালোয়ানকেও খেতে হয়েছিল। সেও ক্রমান্বয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী কমিউনিষ্ট, র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাট প্রভৃতি হয়ে নানা

ঘাটের জল খেয়ে শেষকালে যখন তীরে উঠল তখন চাকরি জুটে গেছে তার একটা। মাইনে বেশী নয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা আছে।

এই সময় তার সঙ্গে আমার দেখা হল একদিন হঠাৎ রাস্তায়। সহপাঠী ছিল, অনেকদিন পরে দেখা হওযাতে আনন্দিত হলাম। কথা কইতে কইতে কখন যে কলেজ ষ্ট্রীট থেকে জগুবাবুর বাজারের কাছাকাছি এসে গেছি খেয়াল ছিল না। হেঁটেই যাচ্ছিলাম, পালোয়ানের রাজনৈতিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনতে শুনতে।

পালোয়ান হঠাৎ থেমে বললে—"এই কাছেই আমার মেস, যাবি ?"

গেলাম তার মেসে। তেতলার একখানি পুরো ঘর নিয়ে পালোয়ান থাকে দেখলাম। মার্জিত রুচির পরিচয় ঘরের চতুর্দিকে ছড়ানো। বললে মাত্র একশ কুড়ি টাকা মাইনে পায়, তাতে এরকম ভাবে থাকে কি করে? প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আরও বিস্ময়জনক ঘটনা ঘটল। এ ঘটনার পূর্ব্বাভাস পেলে পালোয়ান আমাকে তার মেসে নিয়ে যেত না হযতো। একটি লোক ঘরে ঢুকে বলল—

"সুখলালবাবু, আপনাকে নীচে ফোনে ডাকছে—"

"ও আচ্ছা, যাচ্ছি আমি!" আমার দিকে ফিরে বললে—"আসছি ভাই এখুনি—" সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—পালোয়ানের ভাল নাম কি সুখলাল? জানতাম না তো? টেবিলের উপর দেখলাম চিঠি রয়েছে অনেক। প্রত্যেকটির উপর যে নাম রয়েছে তা পালোয়ান পাকড়াশী নয়, সুখলাল রায়। সত্যিই বেশ অবাক হয়ে গেলাম। একটু পরেই পালোয়ান ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলাম "সুখলাল নাম তোর আগে শুনিনি।"

পালোয়ান স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল ক্ষণকাল। তারপর হেসে বললে—"নাম বদলেছি। নামটা তো বাইরের পোষাক, দরকার মতো ওটা বদলাতে হয়। সুখলাল রায় নামটা কি খারাপ হয়েছে? চমৎকার গোল নাম,

নিজেকে বাঙালী, বেহারী, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ এমন কি হরিজন বলেও চালানো যায়—"

তারপর আর একটু হেসে বললে, "চা খাবি, না কফি—"

"কিছু দরকার নেই। তুই নামটা বদলালি কেন সেইটেই বরং বল, অবশ্য বলতে যদি বাধা না থাকে—"

"না, তোকে বলতে আর বাধা কি। তবে কথাটা ব'লে বেড়াস না যেন। চল, বেরুই তাহলে, রাস্তায় যেতে যেতে বলব। আমাকে যেতেও হবে এক জায়গায়—"

দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

পালোয়ান হেসে বললে, "এক জায়গায় মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। যাবি?"

"মেয়ে? কার জন্যে?"

"তোর যদি পছন্দ হয় তুইই বিয়ে করতে পারিস। তোকে আমার ভাই ব'লে পরিচয় দেব—"

ব'লে হাসলে একটু। তারপর আসল কথাটা বললে। মেয়ে দেখে বেড়ানো ওর পেশা একটা। রোজ দু'টো ক'রে মেয়ে দেখে, একটা সকালে, একটা বিকেলে। ওতেই প্রায় দু' বেলার খাওয়াটা হয়ে যায়। কন্যাপক্ষরা অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন না।

বছর খানেক পরে—তখন আমি মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জন, হঠাৎ একদিন ইডেনের সামনে পালোয়ানের সঙ্গে আবার দেখা।

"কিরে এখানে কেন—?"

"আমার বউ-এর পেটে অপারেশন হয়েছে—"

"কি, অপারেশন—?"

"হিস্টেরেক্টমি। জরায়ুটা কেটে বাদ দিয়েছে একেবারে—"

"ছেলে পিলে হয়েছে তোর?"

"না—"

"চল দেখে আসি।"

গিয়ে দেখলাম পালোয়ানের বউকে। বেশ রূপসী বউ। দুঃখ হ'ল তার আর ছেলে-মেয়ে হবে না ভেবে। অমন সুন্দরী মেয়ে, মা হলে কি চমৎকার মানাতো! নিঃসন্তান জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে বেচারার।

একেবারে ব্যর্থ কিন্তু হয়নি। উক্ত ঘটনার বছর খানেক পরে আবার দেখা হয়েছিল পালোয়ানের সঙ্গে চৌরঙ্গীতে। দেখলাম একটা দামী মোটরে সে তার বউকে তুলে দিচ্ছে। আমি যে ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়েছিলাম তা' সে টের পায়নি। মোটরটা যখন চ'লে গেল তখন ফিরেই সে আমাকে দেখতে পেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"মোটরে তোর বউ গেল, না?"

"হ্যাঁ"

"প্রাইভেট কার দেখলাম। তোর না তোর শ্বশুরের—?"

পালোয়ান হাসল একটু।

"চল, ওপরে চল, সব বলছি। হ্যাঁ, এই সিঁড়ি, আজকাল এইখানেই থাকি। ওপরে একটা ফ্ল্যাট্ নিয়েছি—"

আমার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল, এখানে ফ্ল্যাট্ নিয়ে থাকা সোজা নয়, অনেক পয়সা লাগে।

ওপরে গিয়ে একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। রীতিমত আমিরী কাণ্ড কারখানা।

পালোয়ান হঠাৎ আমার দু' কাঁধে দু'টো হাত রেখে বললে—"তোর কাছে লুকোব না কিছু! বউকে আমি ভাড়া দিই। মাসে অ্যাভারেজে হাজার দুই টাকা রোজকার হয়!"

বজ্রপাত হলেও আমি অত বিস্মিত হ'তাম না।

"তোর বউ আপত্তি করে না?"

"প্রথম প্রথম করত, এখন আর করে না। কিছুদিন পরে ছবির পর্দাতেও ওকে দেখতে পাবি—"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই নিজে এতে সুখী হয়েছিস্?"

"আমি আর একটা বিয়ে করেছি। সাদামাটা গেরস্ত ঘরের মেয়ে। মাস দুই আগে একটি খোকা হয়েছে। তোকে নিয়ে যাব একদিন সেখানে। যাবি?"

গিয়েছিলাম। সত্যিই দেখলাম পালোয়ানের ছোট্ট সংসারটি চমৎকার। তার স্ত্রী অবশ্য একথা জানত না যে তার সংসার খরচের টাকা জোগাচ্ছে তার সুন্দরী সতীন। সতীনও পালোয়ানের দ্বিতীয় সংসারের খবর জানত না।

কিছুদিন আগেই চার্লি চ্যাপলিনের মঁশিয়ে ভারদু দেখেছিলাম, দেখে মুগ্ধও হয়েছিলাম। সুতরাং পালোয়ানের উপর রাগ করতে পারল্যাম না।

আপনারাও করবেন না।

কাক চরিত্র

আমি যেখানে বসিয়া লিখি তাহার ঠিক সামনেই একটি জানালা আছে। জানালা দিয়া খানিকটা আকাশ এবং একটি সজিনা গাছ দেখা যায়। সজিনা গাছের একটি ডাল আমার জানলার দিকে প্রসারিত। মনে হয় সে যেন আমার ঘরে ঢুকিয়া আমার সহিত আলাপ জমাইতে চায়। তাহার পত্র-পল্লব-ফুল-ফলের নীরব আলাপ দূর হইতেই রোজ শুনি, প্রতি ঋতুতে তাহার আলাপের সুর বদলাইয়া যায় তাহাও লক্ষ্য করি, কিন্তু সবটা যে বুঝিতে পারি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তবু রোজ চাহিয়া থাকি। প্রত্যহ লিখিতে বসিয়া ওই তরুণ সজিনা-শাখাটির জন্য অনেকটা সময় ব্যয় করিতে হয়। একদিন এই সজিনা-শাখায় একটি কাক আসিয়া বসিল। শুধু বসিল না, নানাভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। মনে হইল সে-ও যেন আমার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক। এ বিষয়ে আমার ঔৎসুক্য কম নয়। আড্ডা দিতে চিরকালই ভালবাসি। অবশ্য আড্ডাটা যদি মনোমত হয়। মানে, তাহাতে যদি পরনিন্দা এবং পরচর্চ্চার মশলা থাকে। সাধারণ লোকেদের সহিত এ বিষয়ে আমাদের (মানে, লেখকদের) বিশেষ কোনও তফাৎ নাই। একটু তফাৎ অবশ্য আছে। সাধারণ লোকেরা সকলের সহিত সমানভাবে আড্ডা দিতে পারে না। লেখকরা পারে। আকাশ, বাতাস, ফুল, পশু, পক্ষী সকলেরই সহিত আড্ডা দিবার ক্ষমতা আছে তাহাদের, এ সব ক্ষেত্রে যে ভাষাও তাহারা ব্যবহার করে তাহা সাধারণ মানুষের ভাষা নয়, হৃদয়ের ভাষা। কল্পনার ভাষাও বলিতে পারেন।

এই ভাষায় উক্ত কাকের সহিত আমার আলাপ জমিয়া গেল। আপনাদের সুবিধার জন্য সে আলাপ বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি। হয়তো কিছু মজা পাইবেন।

"আপনাকে মশায় রোজ ঐ টেবিলে বসে থাকতে দেখি। কখনও হাঁটু দোলান, কখনও দাড়ির ভিতর আঙুল চালান, কখনও আকাশের দিকে চেয়ে শিস্ দেন। কি করেন বলুন তো ওখানে বসে?"

"লিখি।"

"মানুষদের মধ্যে অনেকেই লেখেন দেখেছি। আমাদের খাজাঞ্চি মশাইও রোজ হিসেব লেখেন। আপনি?"

"আমি গল্প লিখি, কবিতাও লিখি—"

"কিসের গল্প—?"

"মানুষেরই গল্প। তাদের সুখ-দুঃখ, রং-ঢং এই সব আর কি।"

"ও, তা আমি আপনাকে অনেক গল্প বলতে পারি। অনেক লোকের বাড়িতে যাই তো, অনেকেরই হাঁড়ির খবর রাখি। আমার কাছে কেউ কিছু গোপন করে না, মনে করে ও একটা কাক তো। কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি। বেশ মজা লাগে। আপনি আপনার পাশের বাড়ির লোকের যে খবর জানেন না, আমি তা জানি—"

"পাশের বাড়িতে তো নগেনবাবু থাকেন—"

"হ্যাঁ। তার কি খবর জানেন আপনি বলুন"

"পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে ভদ্রলোক বলেই তো মনে হয়। কথাবার্তাও ভালো। খুব দামী স্যুট পরে' রোজ বেরিয়ে যান আপিসে, মনে হয় ভালো চাকরিই করেন।

"চাকরির খবর জানি না, কিন্তু বাড়িতে কি খান তা জানি। একবেলা মুড়ি, আর একবেলা এক-তরকারি ভাত, তাও নিরামিষ। ন'মাসে ছ'মাসে মাছ ঢোকে বাড়িতে। ভদ্রলোক বাইরে খুব ফিটফাট বটে কিন্তু বগলে দাদ আছে, রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মলম লাগান। জানতেন এ-সব কথা?"

স্বীকার করিতে হইল জানিতাম না।

ঘাড়টি বাঁকাইয়া কাক পুনরায় সুরু করিল—"নিকুঞ্জবাবুকে চেনেন?"

"চিনি বই কি। খুব গোঁড়া ধার্ম্মিক লোক—"

"কক্ কক্ কক্—"

মনে হইল হাসিতেছে।

"নিকুঞ্জবাবু ধার্ম্মিক হয় তো, কিন্তু ওঁর স্ত্রীটি ডুবে ডুবে জল খান। আমি রোজ সেই সময় ওদের উঠোনে গিয়ে ওদের এঁটো থালা-বাসন হাঁটকে দেখি যদি খাবারের টুকরোটাকরা পাওয়া যায় কিছু। প্রায়ই থাকে না, ওরা অধিকাংশ দিনই ডিম খায় কি না—"

"নিকুঞ্জবাবুর অতবড় টিকি, গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক, উনিও ডিম খান?"

"উনি ডিমের যম একটি।"

কাক পুনরায় কক্ কক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

"দেখুন, আপনি আপনার পাড়া-পড়শীর কোন খবরই রাখেন না। আপনার জানালা দিয়ে দূরে ওই যে প্রকাণ্ড সাদা দোতলা বাড়িটা দেখছেন ওর খবর রাখেন কিছু?"

"ওটা তো শালিকপুরের জমিদারদের বাড়ি—"

"এককালে ছিল হয়তো। এখন ওর বংশের একগাদা ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী হয়েছে। শালিকপুরের জমিদারি ভাগ হয়ে হয়ে চটকস্য মাংসের চেয়েও কম পড়েছে প্রত্যেকের ভাগে। কিন্তু ওদের ঠাট্টা দেখেছেন?"

"তাতো দেখেছি—"

"পয়সা আসে কোথেকে?"

"তাতো জানি না—"

"শুনুন তাহলে। হাবুলবাবু কালোবাজারের দালালী করেন, কমলবাবু করেন ঘুসের দালালী। বড় বড় অফিসাররা ওঁর মারফৎ ঘুস নেয়, উনি কমিশন মারেন। চামেলী মেয়েটা একটা মাড়োয়ারীর সঙ্গে ভাব করেছে। রোজ বিকেলে প্রকাণ্ড একখানা মাস্টার বুইক আসে দেখেন নি? শেফালী সিনেমা-ডিরেক্টারকে বিয়ে করেছে। মণ্টু জুয়ার আড্ডায় ভিড়েছে। জানতেন এ-সব খবর?"

"না—"

"আরও শুনুন—"

কাক ক্রমাগত বলিয়া যাইতে লাগিল। অবাক হইয়া গেলাম। এতগুলি প্রতারক দুশ্চরিত্র নর-নারীর সান্নিধ্যে বাস করিতেছি, অথচ তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। একটা লোকও ভাল নয়। কি আশ্চর্য!

"আবার আসব। আরও অনেক গল্প শোনাব আপনাকে—"

কাক উড়িয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল সজিনার ডালটাও যেন আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

কাকটি উপর্য্যুপরি তিন দিন আসিল না।

চতুর্থ দিনে পুনরায় তাহার দেখা পাইলাম। মনে হইল কেমন যেন বিমর্ষ উস্‌কো-খুস্‌কো ভাব।

"কি খবর?"

"খবর খুব সাংঘাতিক—"

"কি রকম—?"

"এখনই আবিষ্কার করলাম যে বাচ্ছাগুলিকে এতদিন নিজের বলে' মনে করছিলাম—সেগুলি আমার বাচ্ছা নয়, কোকিলের বাচ্ছা। একটিও আমার নয়—"

তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম কি করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে।

কাক উত্তর দিল—"আমাকে কি আপনি নিকুঞ্জবাবু পেয়েছেন? কি করে' সম্ভব হয়েছে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। ওর সঙ্গে আর পোষাবে না। থাকুক ও কোকিলের বাচ্ছা নিয়ে। আমি আবার একটা জুটিয়ে নেব। ওদের তো অভাব নেই।—"

কা কা করিতে করিতে কাক উড়িয়া গেল।

ছবি

ভ্রমর কুসুমকে ঘিরিয়া গান করে, চিরকালই করিতেছে। ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। সেদিন কিন্তু কিছু নূতনত্ব হইল। যে যুবক-ভ্রমরটি অর্ধ-স্ফুট মালতী মুকুলের দিকে আবেগভরে উড়িয়া আসিতেছিল, সে সহসা থামিয়া গেল। মালতীমুকুলের কাছে ওটা কি? সাপ না কি! সাপের মতোই ফণা তুলিয়া আছে যেন! ভ্রমর দূর হইতেই উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিল ব্যাপারটা কি। দেখিল জিনিসটা অনড়। সাপ হইলে নড়িত নিশ্চয়। সহসা খানিকটা রোদের ঝলক পড়িল তাহার উপর। চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল। ভ্রমরের বিস্ময় বাড়িয়া উঠিল। কি ওটা!......

সহসা তাহার চোখে পড়িল মালতীমুকুল আর একটু ফুটিয়াছে। আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। উড়িয়া গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল। ঠিক পাশেই সাপের মতো ফণা তুলিয়া যে অদ্ভুত জিনিসটা ছিল তাহার অস্তিত্বই সে ভুলিয়া গেল।

কাছেই আরও দুইজন লোক আরও কয়েকরকম যন্ত্র লইয়া বসিয়াছিল, ভ্রমর তাহাদেরও দেখিতে পাইল না।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

দেখিতেছি সেই ভ্রমর এখনও সেই মালতীমুকুলকে ঘিরিয়া গুঞ্জন করিতেছে। অর্ধ-স্ফুট মুকুল এখনও পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয় নাই। যেমন ছিল তেমনি আছে। সবই আছে নাই কেবল......

"ছি, ছি কি করছ, ছাড় লাগে!—"

"দুষ্টু কোথাকার, মিথ্যুক !—"
"সত্যি লাগছে !—"

হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর একটা ছবি মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কি বলিতেছিলাম? সবই আছে, নাই কেবল সেই সজীব শ্যামল কানন-কুঞ্জটি। ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে ছায়া-ছবির পরদায়। দুই বৎসর পূর্ব্বে কৌশলী বিজ্ঞানীরা তাহার অভিসার-লীলার ছবি তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। সহসা মনে হইল দ্বিতীয় যে ছবিটি আমার মানসপটে জাগিল, যাহা বহুকাল পূর্ব্বে হারাইয়া গিয়াছে, তাহা কি কোথাও কোনও ছায়াছবিতে এমনি করিয়া বাঁচিয়া আছে?

দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ

তিনি বলিতেছিলেন, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছিল।

"দেখ, আমরা সকলেই ভ্রমণশীল, কেহই এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। বসিয়া থাকিবার উপায় নাই, জীবনই আমাদের চালিত করিতেছে, আন্তরিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই আমরা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। কত স্থানে যে গিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সেদিন যে অদ্ভুত দেশে আমি গিয়া পড়িয়াছিলাম, তেমন বিচিত্র দেশে আমি আর কখনও যাই নাই, যাইব বলিয়া কল্পনাও করি নাই। সে দেশের গল্পই আজ তোমাদের শুনাইব।

আমি সেদিন যে ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়াছিলাম তাহা নয়। আমি বাহির হইয়াছিলাম খাদ্যসন্ধানে। যে স্থানে প্রত্যহ খাদ্য পাই, সেই স্থানেই আমি গিয়াছিলাম, খাদ্যের সন্ধানও পাইয়াছিলাম। একাগ্র চিত্তে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছি, এমন সময় এক প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আমি যে স্থানটায় ছিলাম, সেই স্থানটাই যেন উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। আমি স্থানচ্যুত হইয়া একটা ঘন জঙ্গলের ভিতর পড়িয়া গেলাম। বিস্ময়ের ভাবটা যখন কাটিয়া গেল চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, স্থানটা নিতান্ত মন্দ নহে। মোটামুটি খাদ্যদ্রব্য সবই পাওয়া যায়। কিছু কিছু সংগ্রহ করিলাম। তাহার পর ইচ্ছা হইল বাড়ি ফিরি, আমার বিলম্ব দেখিয়া তোমরা হয়তো ভাবিতেছ। কি যে ঘটিয়াছে তাহা তোমাদের বলিবার জন্যও মনটা ছটফট করিতেছিল। সেই ঘন অরণ্য হইতে বাহির হইয়া কিন্তু ঘরের দিকে ফিরিতে পারিলাম না। একটা অপরূপ গন্ধ আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিসের গন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম,

ওই গন্ধকে অনুসরণ করা ছাড়া আমার উপায় নাই। একটা অদৃশ্য হস্ত যেন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম জানি না, কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করিলাম আমি একটা কালো রঙের টিপির উপর উঠিয়াছি। টিপি হইতে নামিতে যাইব এমন সময় দেখিলাম, টিপিটাই চলিতেছে। সে-ও যেন গন্ধটাকেই অনুসরণ করিতেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। তাহার পর লক্ষ্য করিলাম, টিপির উপর লম্বা গাছের মত কি যেন রহিয়াছে। সেটা বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম, কিছুদূর উঠিয়াই কিন্তু বিপন্ন হইতে হইল। কে যেন ঝট্‌কা মারিয়া আমাকে ফেলিয়া দিল। যেখানে আমি পড়িলাম তাহা পাথরের মত কঠিন, ঘোর রক্তবর্ণ এবং অতিশয় মসৃণ। এরূপ দেশ পূর্বে কখনও দেখি নাই। সবুজের কোন চিহ্ন বা মাটির কোনও আভাস কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। সেই মধুর গন্ধটা কিন্তু আরও তীব্র— আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল। তাহা যেন আমার সমস্ত সত্তাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি আচ্ছন্নের মত দ্রুতপদে সেই মসৃণ কঠিন রক্তবর্ণ দেশ অতিক্রম করিতে লাগিলাম, সেই মধুর গন্ধই যেন আমার বাহক হইল। কিছুক্ষণ চলিবার পর আর একটি আশ্চর্যজনক বৃক্ষ দেখিলাম। বাদামী রঙ, সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বে এইরূপ একটি অদ্ভুত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, এই বৃক্ষটিতে উঠিব কি না ইতস্তত করিতে লাগিলাম। আমার ইতস্তত ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ টিঁকিল না। যে গন্ধ আমাকে আকৃষ্ট করিতেছিল মনে হইল তাহার উৎস যেন ঊর্ধ্বে, অদৃশ্য শতধারায় তাহা যেন শূন্য হইতে বর্ষিত হইতেছে। আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, সেই অদ্ভুত বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এবার কিন্তু কোনও বিপদ হইল না। বৃক্ষশীর্ষে উঠিয়া দেখিলাম, আর একটি নূতন দেশে উপনীত হইয়াছি। চতুর্দিক শ্যামল। এমন অদ্ভুত সবুজ রঙ্‌ আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মনে হইল, ইহাই বুঝি স্বর্গ। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আরও মুগ্ধ হইতে হইল। দেখিলাম, বিরাট এক দুধের নদী সেই শ্যামল দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। তাহার পর আগাইয়া

গিয়া দুগ্ধ পান করিতে লাগিলাম। আকণ্ঠ পান করিলাম। এমন সুস্বাদু সুমিষ্ট দুগ্ধ বহুকাল পান করি নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছিল, বুকটা যেন জুড়াইয়া গেল। সেই সুমধুর গন্ধ কিন্তু তখনও আমাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, কাছাকাছি কোনও ফুল ফুটিয়াছে কি না। ফুল দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু গন্ধের উৎসটি দেখিতে পাইলাম। দুগ্ধ-নদীর পরপারে বিরাট একটি হ্রদ রহিয়াছে, জলপূর্ণ হ্রদ নয়, মধুপূর্ণ হ্রদ। সেই হ্রদ হইতেই যে এই অপূর্ব সৌরভ নিঃসৃত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ রহিল না। সেই হ্রদের সমীপবর্তী হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু সেই বিরাট দুগ্ধনদী অতিক্রম করিব কিরূপে? শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাহা সমস্ত দেশটাই জুড়িয়া রহিয়াছে। নদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, যদি সন্তরণযোগ্য কোনও ক্ষীণ ধারা পাই।......"

যিনি কাহিনীটি বলিতেছিলেন তিনি রবিনসন্ ক্রুশো, গালিভার অথবা সিন্ধবাদ নহেন, সামান্য একটি পিপীলিকা মাত্র। তাঁহার দৃষ্টি দিয়া তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন মানবীয় দৃষ্টিতে তাহা এইরূপ—

এক কাঠুরিয়া একটি গাছের ডাল কাটিতেছিল। ডাল যখন ছিন্ন হইল, তখন তাহা একটি ঝোপের মধ্যে পড়িল। ডালে একটি পিপীলিকা ছিল, সেটিও ঝোপে পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তি গাছের ডাল কাটাইতেছিলেন তিনি ঝোপের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। পিপীলিকা ঝোপ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার জুতার উপর উঠিল। তিনি যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন পিপীলিকা তাঁহার পা বাহিয়া হাঁটুতে উঠিয়াছে। তিনি হাত দিয়া তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পিপীলিকা তখন লাল সিমেন্ট বাঁধানো ঘরের মেঝের উপর পড়িল। সেখান হইতে সে একটি টেবিলের নিকট উপনীত হইল। টেবিলের পায়া বাহিয়া সে সবুজ অয়েল-ক্লথ-মোড়া টেবিলে আরোহণ করিল। টেবিলের উপর একটু আগে খানিকটা দুধ পড়িয়া গিয়া নানা ধারায় বহিয়া যাইতেছিল। টেবিলের উপর একটি বড় কাচপাত্রে খানিকটা মধুও ছিল।

শিল্পী

অহির সহিত নকুলের অথবা ঘাসের সহিত ছাগলের বন্ধুত্ব আছে ইহা কল্পনা করা কঠিন। জিতুবাবুর সহিত কিন্তু পানুর বন্ধুত্ব ছিল, যদিও তাহাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। জিতুবাবু সুদখোর মহাজন আর পানু তাঁহার কবলস্থ খাতক। উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই ছিল না, চেহারারও নয়, বয়সেরও নয়। জিতুবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি, পানুর বয়স চল্লিশের নীচে। জিতুবাবু কালো, বেঁটে এবং ঈষৎ কুঁজো, সামনের দিকে ঝুঁকিয়া থাকেন, সোজা দাঁড়াইতে পারেন না। পানু ছিপছিপে লম্বা, উন্নত মস্তক এবং সুদর্শন। মতেরও কিছুমাত্র মিল নাই। জিতুবাবু সুদখোর মহাজন, অর্থসঞ্চয় করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং আনন্দ। পানু চিত্রকর, ছবি আঁকিয়া আনন্দ পায়, রং আর তুলি লইয়া খেলা করে এবং পয়সা পাইলেই উড়াইয়া দেয়। তবু দুইজনের বন্ধুত্ব আছে এবং তাহাকে প্রগাঢ় বিশেষণে ভূষিত করিলেও মিথ্যাভাষণ হয় না। জিতুবাবু কখনও যাহা করেন না পানুর ক্ষেত্রে তাহা করেন অর্থাৎ বিনা সুদে, বিনা হ্যাণ্ডনোটে তাহাকে টাকা দেন। আর পানুও কখনও যাহা করে না, জিতুবাবুর ক্ষেত্রে তাহা করে—অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি মতো ঠিক দিনে ঋণটি পরিশোধ করিয়া দেয়। দুই চারিদিন পরে আবার তাহাকে জিতুবাবুর নিকট হাত পাতিতে হয়, জিতুবাবুও পুনরায় টাকা দিতে আপত্তি করেন না। এইভাবেই বহুকাল হইতে চলিতেছে। জিতুবাবুর ধারণা : পানু একটা লক্ষ্মী-ছাড়া, পানুর ধারণা : জিতুবাবু লোকটি স্বল্পবুদ্ধি জানোয়ার বিশেষ। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুকম্পা-শীল, অথচ বন্ধুত্বও খুব।

সেদিন জিতুবাবু পানুর ঘরে ঢুকিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার আনন ঈষৎ ব্যায়ত হইয়া গেল। জিতুবাবু নিঃশব্দ চরণে প্রবেশ করিয়াছিলেন

পানু টের পায় নাই। সে পিছন ফিরিয়া ছবি আঁকিতেছিল। কুঞ্জ জিতুবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরবে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কথা কহিলেন।

"ওটা কি আঁকছ, পেত্নীর ছবি না কি—"

পানু ঘাড় ফিরাইয়া মৃদু হাসিল।

"আর একটু দূর থেকে দেখুন, তা' হলে বুঝতে পারবেন।"

জিতুবাবু একটু পিছাইয়া গেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আর একবার দেখিয়া বলিলেন, "সুঁট্‌কো কালো মেয়েমানুষ একটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে রয়েছে। এই তো? বুকের কাছটা কি বিশ্রী করেছ, এ যে অশ্লীল একেবারে হে! দাঁত বার করে হাসছে আবার! এই ছবি বাজারে বার করবে না কি?"

"বহরমপুরের এক জমিদার হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন ছবিটা।"

"বল কি! হাজার টাকা! পেয়েছ টাকাটা?"

"না পায়নি এখনও। ছবি যেদিন নেবেন সেইদিনই টাকাটা দেবেন বলে গেছেন।"

"ও—"

জিতুবাবু কপালের উপর বাম হাতটা রাখিয়া পুনরায় ছবিটি দেখিলেন। তাহার পর মন্তব্য করিলেন, "আমার বিশ্বাস তিনি আর আসবেন না। বদ্ধ পাগল না হলে এ ছবি পয়সা দিয়ে কেউ কেনে না। মেয়েমানুষই যদি আঁকলে একটা ভদ্র চেহারা আঁকলে না কেন। এই সুঁট্‌কো মেয়ে আঁকবার কল্পনা তোমার হল কি করে—?"

পানু ক্ষণকাল স্মিতমুখে জিতুবাবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর প্রশ্ন করিল—"কালিদাস কে জানেন?—"

"জানি বই কি। ব্যাংকের সেই কেরাণী ছোকরা তো—"

"না, আমি কবি কালিদাসের কথা বলছি।"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—শুনেছি নামটা।"

"তাঁর মেঘদূতের সঙ্গে যদি পরিচয় থাকত তাহলে বুঝতে পারতেন ছবির মানেটা—"

"কি রকম—"

"তাতে কবি যক্ষ-প্রিয়ার যে বর্ণনাটা দিয়েছেন তা অনেকটা এই রকম—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি
মধ্যে শ্যামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা
নিম্ননাভিঃ ॥
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা
স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব
ধাতুঃ—"

জিতুবাবু ঈষৎ ব্যায়ত আননে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত বিখ্যাত শ্লোকটির আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিলেন: ছোকরার গুণ আছে অনেক। এই সব কারণেই পানুকে ভালবাসেন তিনি।

"শ্লোকের মানে কি?—"

"যক্ষ-প্রিয়ার চেহারা কেমন? না, তিনি তন্বী, মানে ছিপছিপে, আপনার ভাষায় সুঁটকো, শ্যামা কিনা শ্যামাঙ্গিনী, শিখরিদশনা মানে যার দাঁতের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি মানে যার নীচের ঠোঁট পাকা তেলাকুচো ফলের মতো, মধ্যে শ্যামা, যার কোমর খুব সরু, চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা—যার ছোট চোখ দুটি চকিতহরিণীর মতো, নিম্ননাভিঃ—যার নাভিদেশ খুব গভীর, শ্রোণীভারদলস-গমনা যিনি নিতম্বের ভারে আস্তে আস্তে চলেন, স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং—স্তনের ভারে যিনি ঈষৎ অবনত—"

জিতুবাবু হাত তুলিয়া পানুকে থামাইয়া দিলেন।

"হয়েছে হয়েছে থাম। আমি তো গোড়াতেই বলেছিলাম—পেত্নী!—কবি কালিদাস না হয় সংস্কৃতে বলেছেন যক্ষ-প্রিয়া। যক্ষ মানে ভূত! যাক—আমি যেজন্য এসেছিলাম বলি। টাকাটা সোমবার দিতে পারবে?"

"আমার তো টাকা দেবার কথা বুধবার—"

"তা জানি। কিন্তু সোমবার পেলে আমার ভাল হত!"

"আপনি তো ব্যাংকে জমা দেবেন? বুধবারেই দেবেন না হয়, সেদিনও তো ব্যাংক খোলা—"

"ব্যাংকে জমা দেব না। অন্য কাজ আছে—"

"কেন আমাকে মিছে ধাপ্পা দিচ্ছেন। আমি জানি এ টাকা আপনি একটিও খরচ করেন না, সব জমা দেন—"

জিতুবাবুও হাসিয়া ফেলিলেন।

"না খরচ করব না। তবে ব্যাংকেও পাঠাব না—"

"পুঁতবেন না কি?"

জিতুবাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"কি করে জানলে তুমি?"

"আন্দাজ করলুম—"

"কথাটা ঘুণাক্ষরে যেন প্রকাশ না পায় ভাই। ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের যে রকম ব্যাপার ব্যাংকের অ্যাকাউণ্ট দেখতে চায়। তাই ভেবেছি যে সব টাকার খবর খাতায় নেই সেগুলো পুঁতে রাখব।"

"বেশ, বুধবারেই পুঁতবেন—"

"সোমবার ভাল দিন। আমি দু' তিনজনকে দিয়ে পাঁজি দেখিয়েছি। মাত্র একশোটা টাকা তো—দিয়ে দিও ভাই"।

"আমার কাছে এক কপর্দ্দকও নেই এখন। বহরমপুরের জমিদার মঙ্গলবার লোক পাঠাবেন বলে গেছেন, সেইদিনই না হয় টাকাটা দিয়ে দেব আপনাকে সন্ধ্যাবেলা—"

"না, সোমবার সকালে আমার চাই। দিও বুঝলে—"

জিতুবাবু পানুর হাত দুইটি ধরিয়া ফেলিলেন।

পানু স্মিতমুখে বিপন্ন জিতুবাবুর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া ফেলিল। কি অসহায় জীব!

"বেশ, চেষ্টা করব—"

"চেষ্টা নয়, চাই-ই সেদিন!"

"বেশ—"

শুক্রবার সকালে পানু এক ঝুড়ি লিচু লইয়া জিতুবাবুর বাসায় হাজির হইল। হাতে একটি পাঁজি। পাঁজি খুলিয়া পানু বলিল, "আজও দিন ভাল, এই দেখুন। শিবু ভট্‌চাজ দেখে দিয়েছে—"

"সোমবার দিন তো আমি কাজ চুকিয়ে ফেলেছি। আর ভাল দিন দেখে কি হবে!"

পানু হাসিয়া বলিল—"আমি সেদিন আপনাকে যে একশ' টাকার নোটটা দিয়েছিলাম সেটা বার করে এই টাকাগুলো সেখানে রেখে দিন—"

"কেন?"

"সে নোটটা জাল ছিল। আমি এঁকে দিয়েছিলাম। আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন, কিন্তু আপনার চোখে ধুলো দেওয়া কত সহজ দেখুন। এই নিন—একশ' টাকার কয়েন—"

গণিয়া গণিয়া টাকাগুলি জিতুবাবুর সম্মুখে রাখিয়া পানু বলিল "আপনি লিচু ভালবাসেন তাই আপনার জন্য কিছু লিচু কিনে নিয়ে এলাম। আপনার জন্যে খুব ভাল একটা ষ্টীল-বক্‌সেরও অর্ডার দিয়েছি। কাল নাগাদ পেয়ে যাবেন—"

জিতুবাবু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন।

"এ সব বলছ কি তুমি?"

"ঠিকই বলছি। বহরমপুরের জমিদার মঙ্গলবার দিন এসে ছবিটা নিয়ে গেছেন। আমি বুধবারেই আসতাম, কিন্তু শিবু ভট্‌চাজ বললে বুধ বৃহস্পতি দুটো দিনই খারাপ। তাই আজ এসেছি আজ দিন ভালো। নোটটা আমাকে বার করে দিন—"

"হাজার টাকা দিয়ে ছবিটা কিনে নিয়ে গেল?"

"হ্যাঁ। আগামী সপ্তাহে কিন্তু আমার কিছু চাই। বেশী নয় গোটা পঞ্চাশেক—"

"হাজার টাকা তো পেয়েছ—?"

"সব ফুঁকে দিয়েছি—"

পানুর চোখের দৃষ্টিতে হাসি ঝলমল করিতে লাগিল।

রূপান্তর

দৈত্যটিকে দেখে আমি মোটেই ভয় পেলাম না, বরং খুশীই হলাম। দৈত্য আমার দিকে খানিকক্ষণ হাসিমুখে চেয়ে রইল, তারপর বলল, "আমি সর্বশক্তিমান, তোমার কি চাই বল—?"

"একটি চাকরি—"

"কি রকম চাকরি?"

"ভালো চাকরি।"

"বেশ, তাহলে তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। আমি একটু ঘুরে আসি।"

প্রকাণ্ড দৈত্য লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে' গেল। আমি চুপ করে' বসে রইলাম। দৈত্যটির গগনচুম্বী শির, তালগাছের মতো প্রকাণ্ড বড় বড় চোখ দেখে আমি বসে' বসে' আশা করতে লাগলাম, এতবড় শক্তিমান পুরুষ নিশ্চয়ই আমার জন্যে ভাল চাকরি জোগাড় করতে পারবেন একটা।

কিছুক্ষণ পরে দৈত্য ফিরল। তার বগলে প্রচুর কাগজ, হাতে একটা ফাউন্টেন পেন।

"দরখাস্ত লেখ।"

"কোথায় দরখাস্ত লিখতে হবে?"

"ঠিকানা এনেছি।"

কয়েকটি খবরের কাগজ আমার সামনে ফেলে দিয়ে দৈত্য বললে—"এগুলোর মধ্যে অনেক চাকরির খবর আছে। সব জায়গায় দরখাস্ত করে দাও। তারপর আমি ওগুলো নিয়ে টাইপ করিয়ে যেখানে যেখানে দেবার দিয়ে আসব।"

পঁচিশ খানা দরখাস্ত লিখে দৈত্যের হাতে দিলাম। দৈত্য চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে যখন সে আবার ফিরল তখন বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম

দৈত্য আর দৈত্য নেই বামন হয়ে গেছে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে সে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"কি হল—?"

কোনও কথা বললে না, দু'হাতের বুড়ো আঙুল নাড়তে লাগল শুধু।

"আপনি এত ছোট হয়ে গেলেন কি করে?"

"অপমানে! আগে বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি চাকরি দেবার যাঁরা মালিক তাঁরা আমার চেয়েও ঢের বেশী শক্তিমান।"

"আমার গতি তাহলে কি হবে?"

"গতি করেছি একটা।"

বামন পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একটু ইশারা করতেই একটি ভদ্রলোক শূন্য থেকে আবির্ভূত হলেন।

এঁর একটি সুন্দরী বয়স্থা মেয়ে আছে। তাকে তুমি বিয়ে কর। ইনি তোমাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পণ দেবেন। সেই টাকা দিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা কর একটা—"

এই বলে বামন অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পূর্বে যার ললাট গগন স্পর্শ করেছিল দেখতে দেখতে শূন্যে মিলিয়ে গেল সে।

বামনের আদেশ অমান্য করিনি। এই যে মনোহারী দোকানটি দেখছেন এটি আমার শ্বশুর মশায়ের টাকাতেই করেছি।

দৈত্য আর বামনের কথা শুনে আপনারা হয়তো অবিশ্বাসের হাসি হাসছেন, ভাবছেন হয়তো গাঁজা-টাজা খাই।

না, সে সব কিছু নয়। জ্ঞান-সমুদ্রে আমি যে জালটি ফেলেছিলাম তাতে একটি কলসী উঠেছিল, আর সে কলসীর ভিতর ছিল ওই দৈত্যটি! কলসীটির নাম ডিগ্রি আর দৈত্যটির নাম অহমিকা। আরব্য উপন্যাসে এই কাহিনীরই আপনারা যে রূপ দেখেছেন এ গল্পে সে রূপ নেই। থাকবে কি করে? আমি তো আরবী নই আমি বাঙালী, আর দেশটাও আরব নয়, ভারতবর্ষ।

প্রারম্ভ

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, বিশ্বম্ভর তখনও আপিস হইতে ফিরিল না। পত্নী দুর্গামণি খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার পাশেই শুইয়া ছিল। পাশের বাড়ির ঘড়িতে দশটা বাজার শব্দে উঠিয়া বসিল। এখনও উনি আপিস হইতে ফিরিলেন না কেন? বিশ্বম্ভর ব্যাংকে কাজ করে, আপিস হইতে ফিরিতে তাঁহার একটু দেরী-ই হয়, কিন্তু এতো দেরী তো কোনদিন হয় না। ইহার পর দুর্গামণির মনে পড়িল ও-বেলার রাঁধা ভাত ডাল তরকারি খারাপ হইয়া গেল না তো! চাল ডাল ফুরাইয়াছে, এবেলা তাই সে রাঁধিতে পারে নাই। বাজার করিতে গিয়াই কি উনি এত দেরি করিতেছেন? কিন্তু আজ তো মাহিনা পাইবার দিন নয়, কাল মুদির দোকান হইতে ধারেই জিনিষপত্র কিনিয়া দিবেন বলিয়া গিয়াছেন, এত রাত্রে কি মুদির দোকান খোলা আছে? এই ধরণের নানা চিন্তা দুর্গামণির মনে জাগিতে লাগিল। তাহার পর মনে পড়িল এ মাসে কাপড়ও কিনিতে হইবে। একটা মশারি কিনিলেও ভালো হয়, যে মশারিটা আছে তাহা বড়ই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, একটু টান পড়িলেই ছিঁড়িয়া যায়, তালির পর তালি পড়িয়াছে, আর কত তালি দেওয়া যায়, দিয়া লাভও নাই, ঠিক তালির পাশটাতেই ছিঁড়িয়া যায় আবার। তাহার পর মনে পড়িল দুই মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকী পড়িয়াছে। বাড়ি-ওলা প্রত্যহ আসিতেছে। সেমিজ ছিঁড়িয়াছে, বালিশের ওয়াড় নাই। এসব কথা স্বামীর কাছে বলিতেও তাহার সঙ্কোচ হয়। মাত্র পঁচাত্তর টাকা তো মাহিনা। আগে কিছু বাঁচিত কিন্তু খোকা হওয়ার পর, খরচ বাড়িয়াছে। দুধের রোজ করিতে হইয়াছে, টুকিটাকি নানা জিনিসও কিনিতে হয়। উনি সংসারের ন্যায্য খরচের বিষয় কৃপণ, কিন্তু খোকনের বেলায় দিল দরিয়া। সেদিন পট্ করিয়া গোটা দুই রঙীন ফ্রক কিনিয়া

আনিয়াছেন, কিছুই দরকার ছিল না অথচ সমস্ত মাসের খরচ দুই সের ডা'ল তাহা প্রাণ ধরিয়া কিনিয়া দিতে পারেন না। বলেন দেড় সের হইলেই চলিয়া যাইবে। খোকনের বয়স তিনমাস হইতে না হইতেই তাহার জন্য একটি রঙীন ঝারা কিনিয়া আনিয়াছিলেন, নগদ দুই টাকা খরচ করিয়া! এমনি নানা কথা মনে পড়িতে লাগিল দুর্গামণির। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে আবার খোকনের পাশে শুইয়া পড়িল।

…বিশ্বম্ভর ফিরিল রাত্রি বারোটার পর। দুর্গামণি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"তুমি কি ক'রে এলে, সদর দরজা তো বন্ধ!"

"চুপ! আমি জানলা গ'লে ঢুকেছি!"

"কেন?"

"চেঁচিও না সব বলছি। এই নাও—"

বিশ্বম্ভর একটা কাগজের প্রকাণ্ড পুলিন্দা দিলেন।

"কি এতে?"

"টাকা। ত্রিশ হাজার টাকা—"

"ত্রিশ হাজার টাকা! কোথা পেলে?"

"কালই জানতে পারবে। আমি এখন চললুম। টাকাটা সাবধানে রেখ, লুকিয়ে রেখ। এই টাকা দিয়ে খোকনকে মানুষ কোরো, আমি হয়তো আর ফিরব না, ফিরতে পারব না। কিন্তু তোমরা সুখে আছ, টাকার অভাবে কষ্ট পাচ্ছ না, এ ধারণাটাকেই আঁকড়েই যেখানেই থাকি আমি সুখে থাকব। টাকাটা কিন্তু সাবধানে রেখ আর পারো তো কালই বাপের বাড়ি পালিয়ে যেও—আমি চললুম। খোকন ঘুমুচ্ছে?—"

ঘুমন্ত খোকনকে বুকে তুলিয়া বিশ্বম্ভর চুম্বন করিল। দুর্গামণিকেও করিল। তাহার পর ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিল।

"ভেবে দেখলাম তোমাদের এখানে থাকা ঠিক নয়। তোমরাও আমার সঙ্গে চল। তোমাকে বাপের বাড়িতে রেখে দিয়ে যাই। টাকাটা তা না হলে হয়তো বেহাত হ'য়ে যাবে। এখুনি হয়তো পুলিশ এসে পড়বে।"

পরদিন জানা গেল ব্যাংকের খাজাঞ্চিকে হত্যা করিয়া বিশ্বম্ভর ত্রিশ হাজার টাকা অপহরণ করিয়াছে। যথারীতি পুলিশ তদন্ত করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর কিন্তু ধরা পড়িল না। পুলিশ বিশ্বম্ভরের শ্বশুরবাড়িতে গিয়াও হানা দিয়াছিল, কিন্তু দুর্গামণির নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করিতে পারে নাই। দুর্গামণি বলিয়াছিল বিশ্বম্ভর তাহাদের সেই রাত্রেই এখানে জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। কেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই বলে নাই। সেই রাত্রেই বিশ্বম্ভর চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর ফেরে নাই, কোনও খবরও দেয় নাই।

পুলিশ প্রশ্ন করিয়াছিল—"টাকার কথা কিছু জান ?"

"না—"

বিশ্বম্ভর স্বহস্তে টাকাটা মাটির নীচে পুঁতিয়া দিয়া গিয়াছিল। কোথায় পুঁতিয়াছে তাহা অবশ্য দুর্গামণির অবিদিত ছিল না।

বিশ্বম্ভর রাত্রির অন্ধকারে হাঁটিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে সে অবশেষে খড়গ্‌পুর ষ্টেশনে পৌঁছিল। শুনিল একটু পরেই নাকি মাদ্রাজ মেল আসিবে। মাদ্রাজেরই একটা টিকিট কাটিয়া সে মাদ্রাজ মেলে চড়িয়া বসিল। মাদ্রাজে পৌঁছিয়া সে বেশ পরিবর্তন করিয়া কুলি সাজিল। কিছুদিন কুলি-গিরি করিয়াই কাটাইল। তাহার পর একটা মিলে কিছুদিন কাজ করিল। রিক্‌শা টানিল কিছুদিন। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর আসিল গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন। একজন নেতা দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য 'ভাড়া-করা' ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করিতেছিলেন। বেশী মজুরির লোভে বিশ্বম্ভর কিছুদিন ভলান্টিয়ারিও করিল। কিন্তু বেশীদিন করিতে সাহস করিল না, মনে হইল পুলিশের সংশ্রব এড়াইয়া চলাই ভালো। একটা হোটেলে কিছুদিন কাজ করিল, নানারকম রান্না শিখিল। তাহার পর একটা সাহেবের খানসামা হইয়া গেল। সাহেবের সিংহলে নারিকেলের ব্যবসা ছিল, মাদ্রাজ হইতে তিনি সিংহলে গেলেন। বিশ্বম্ভরও তাঁহার সহিত গেল। সাহেবের নারিকেল ব্যবসায় সিংহলেই সীমাবদ্ধ ছিলনা,

সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিয়ো প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও বিস্তৃত কারবার ছিল তাঁহার। বিশ্বম্ভর তাঁহার ভৃত্য-রূপে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল। তাহার আচার-ব্যবহার, বেশ-বাস, ভাব-ভঙ্গীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল, পূর্বপরিচিত অনেক কিছুই সে ভুলিয়া গেল, কিন্তু দুর্গামণি ও খোকনকে এক নিমেষের জন্য ভুলিল না। তাহারা যে সুখে আছে, অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে না, এই ধারণায় মশগুল হইয়া সে সবপ্রকার দুঃখকে তুচ্ছ করিতে লাগিল।

প্রায় ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যে সাহেবের অধীনে বিশ্বম্ভর চাকরি করিতেছিল সে সাহেবও আর বাঁচিয়া নাই। বিশ্বম্ভরের কর্ম্ম-তৎপরতায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বিশ্বম্ভরকে তাঁহার একটা কুঠির ম্যানেজার পদে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বম্ভরের আজ অর্থাভাব ঘুচিয়াছে। তাঁহার ব্যাংকে বেশ কিছু টাকা জমিয়াছে। হঠাৎ কিন্তু একদিন একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। মানসিক বিপর্য্যয়। বিশ্বম্ভরের মনে হইল সে নিজের স্ত্রী পুত্রের জন্য প্রচুর অর্থ রাখিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু যে নিরীহ খাজাঞ্চিকে হত্যা করিয়া সে টাকাটা সংগ্রহ করিয়াছিল তাহার পরিবারের জন্য সে তো কিছুই করে নাই! খাজাঞ্চি লোক খারাপ ছিলনা, তাহার বিস্ফারিত চক্ষু যুগল, রক্তাক্ত দেহটা বিশ্বম্ভরের মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। হাতুড়ির এক আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, সে ভালো করিয়া আর্তনাদও করিতে পারে নাই। সেই হয়তো পরিবারের একমাত্র ভরসা-স্থল ছিল···চিন্তাটা ক্রমশ তাহাকে পাইয়া বসিল। সে অস্থির হইয়া উঠিল, তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল এই পাপের ফলে দুর্গামণি এবং খোকনও হয়তো কষ্ট পাইতেছে। টাকা পাইয়াও হয়তো কিছু সুবিধা হয় নাই, হয়তো পুলিশে টের পাইয়াছে, হয়তো চোরে বা ডাকাতে চুরি করিয়া লইয়াছে···। বিশ্বম্ভর বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিল। অবশেষে সে ঠিক করিল দেশে ফিরিবে, খাজাঞ্চির খোঁজ করিয়া, তাহার পরিবারবর্গকে কিছু অর্থ দিয়া আসিবে। সম্ভব হইলে দুর্গামণি ও খোকনের খবরও লইবে।

বিশ্বম্ভর দেশে ফিরিয়া প্রথমে খাজাঞ্চিরই খোঁজ করিল। শুনিল তাহার একটি পুত্র এক সওদাগরি অফিসে চাকুরি করে। ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া সে তাহাদের বাসায় গিয়া হাজির হইল। বলিল, "আমি আপনাকে কিছু টাকা দিতে এসেছি। বিশ্বম্ভর বাবু টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন—"

"বিশ্বম্ভর বাবু কে!"

"যিনি আপনার বাবাকে খুন করেছিলেন—"

"ও! কোথায় তিনি?"

"মারা গেছেন। আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন, বলে গেছে· আমি যেন টাকাটা আপনাকে দিয়ে দিই—"

"আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল কি করে?"

"সিলোনে আমরা একসঙ্গে ছিলাম।"

"ও, আচ্ছা। সন্ধ্যাবেলা আসবেন, তখনই টাকা নেব। এখন আ· একটু দরকারে বাইরে বেরুচ্ছি—"

বিশ্বম্ভর ভাবিয়াছিল ছেলেটির চোখে সে ধুলা দিতে পারিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া কিন্তু তাহার ভুল ভাঙিল। ছেলেটি পুলিশে খবর দিয়াছিল। ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। বিশ্বম্ভর আর স্ত্রী-পুত্রের সন্ধান লইবার সময় পাইল না।

বিচারে বিশ্বম্ভরের ফাঁসি হইয়া গেল।

একটি খবর জানিতে পারিলে বিশ্বম্ভরের মনোভাব কি হইত তাহা জানি না। হয়তো হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিত, কিংবা অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে বিস্মিত হইত। যে বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিল সে তাহার খোকন। যে অর্থ সে রাখিয়া গিয়াছিল সেই অর্থে-ই সুশিক্ষিত হইয়া বিলাত হইতে আই, সি, এস পাশ করিয়া খোকন জজ হইয়াছিল।

চুনোপুঁটি

পাঁচ বৎসর পরে পুঁটি দেশে ফিরিতেছে। দেশ মানে, মোহনপুর গ্রাম। এই মোহনপুর হইতে পুঁটিকে একদা পলায়ন করিতে হইয়াছিল। সে চুরি কিম্বা খুন করে নাই, বস্তুত পিনাল কোডের কোনও ধারাই তাহার গ্রাম-ত্যাগের হেতু ছিল না। তাহার অপরাধ—সে কালো। তদুপরি পিতৃহীন এবং দরিদ্র। শতাধিক লোক তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে বধূরূপে নির্বাচন করিবার প্রেরণা পায় নাই। পুঁটির বিধবা মা একজনের পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়াছিলেন তবু তাহার মন গলে নাই। শরৎবাবুর 'অরক্ষণীয়া' গল্পেরই পুনরাবৃত্তি চলিতেছিল। এক্ষেত্রেও একজন বড়লোকের ছেলে ছিল। গ্রামেরই একজন ধনী মহাজনের পুত্র, ধীরেশ। পালটি ঘর বলিয়া পুঁটির মা সসঙ্কোচে একদিন তাহার নিকট কথাটা পাড়িয়াছিলেন। ধীরেশ তাহার প্রিয় বন্ধু কদমের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, পুঁটির বিধবা মা পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিলেন। সুযোগ দেখিয়া পুঁটির মা কথাটা তাহার কাছে পাড়েন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, ধীরেশ যদি আশ্বাস দেয় তাহা হইলে তাহার বাবার পায়ে গিয়া আছড়াইয়া পড়িবেন। কথাটা শুনিয়া ধীরেশ কয়েক মুহূর্ত্ত ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছোকরা বি-এস-সি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"নেপচুনের নাম শুনেছেন?"

"নেপচুন? না। নেপালের নাম শুনেছি। ও হ্যাঁ, আমাদের ফুলুর খোঁড়া ছেলের নাম নেংচু রেখেছিল, তার কথাই বলছ কি, ওরা তো এখানে নেই—"

কদম বলিল—"ও কথা ছেড়ে দিন মাসীমা। ধীরুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এক জায়গায়—"

"ও, তাতো জানতুম না বাবা। আমার পুঁটির জন্যে একটি পাত্র দেখে দাও না বাবা তোমরা—"

"চেষ্টা করব।"

পুঁটির মা চলিয়া গেলে কদম জিজ্ঞাসা করিল।

"হঠাৎ নেপচুনের কথা ওঁকে জিগ্যেস করলে কেন?"

"বামন হয়ে চাঁদে হাত' কথাটা প্রচলিত আছে। কিন্তু বামন হয়ে নেপচুনে হাত দিতে চাইছেন উনি। সেই কথাটাই ওঁকে বুঝিয়ে দিতে চাইছিলাম—"

"কল্পনা বটে তোমার—"

কদম মুগ্ধ দৃষ্টিতে ধীরেশের দিকে চাহিয়া রহিল। ধীরেশ বলিল, "মেয়েটার রং যদি আর একটু ফরসা হ'ত তাহলেও ভেবে দেখতাম। মুখ চোখ গড়ন ভালই, কি বলিস্—"

কদম বাম চক্ষুটি কুঞ্চিত করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিল।

ইহার পর হইতে পুঁটির বাড়ির চারিদিকে গ্রামের যুবকদের আনাগোনা শুরু হইয়া গেল। কেহ 'সিটি' দিত, কেহ বাঁশী বাজাইত, কেহ কেহবা জটলা করিত।

পুঁটির মা অবশেষে পুঁটিকে লইয়া গভীর রাত্রিতে একদিন গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কাহাকেও বলিয়া গেলেন না, কোথায় যাইতেছেন।

পাঁচ বৎসর পরে পুঁটি তাহাদের জ্ঞাতিপুত্র চঞ্চলকুমারকে জানাইয়াছে যে সে তাহার স্বামীর সহিত মোহনপুরে আসিতেছে। চঞ্চলকুমার যেন তাহার বাড়িটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইয়া রাখে। ইহার জন্য সে দুইশত টাকা টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়াও দিয়াছে।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে পুঁটি ও তাহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। পুঁটির সাজসজ্জা

রাণীর মতো। সঙ্গে তিনজন চাকর, দুইজন ঝি। পুঁটির স্বামী অনিন্দ্যকান্তি, ঠিক যেন রাজপুত্র! চোখ ধাঁধিয়া গেল সকলের। পুঁটি বলিল, "বছর খানেক আগে মা মারা গিয়েছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পর গ্রামের লোকদের ভাল করে খাওয়াতে। সেই জন্যেই বিশেষ ক'রে এসেছি আমরা—"

বিরাট আয়োজন করিয়া বিরাট ভোজের আয়োজন করিল সে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা, আপামর চণ্ডাল, ইতর ভদ্র কেহই বাদ গেল না। গরীব দুঃখীদের কাপড় দিল পয়সা দিল। গ্রামের স্কুলে, মন্দিরে মোটা টাকা চাঁদা দিল। ধীরেশ এবং কদমেরও তাক লাগিয়া গেল। গরীব দুঃখীরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

গ্রামের পাড়াপড়শীরা যাহারা পূর্বে পুঁটির রূপ লইয়া কত ঠাট্টা, কত বিদ্রূপ করিত তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া শতমুখে পুঁটির রূপের এবং ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লজ্জাবোধ করিল না। পুঁটির স্বামীকে লইয়া গ্রামের ছোকরারা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, যেমন ধনী, তেমনি দিলদরিয়া মেজাজ। চাহিতে না চাহিতে গ্রামের ফুটবল ক্লাবে, শখের থিয়েটারে, হরিসভায় ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া চাঁদা দিল। সকলের সহিত একদিন থিয়েটারও করিল। গানের কি গলা!

দুই সপ্তাহ মোহনপুরকে মাতাইয়া অবশেষে বিদায় লইল তাহারা।

বর্দ্ধমান ষ্টেশন।

পুঁটি বলিল, "চুণো দা এইখানেই নামবে?"

"হ্যাঁ। টাকাটা দিয়ে দাও—"

"দিচ্ছি। দুশো টাকাই নেবে?"

"বাঃ, তাই তো কথা হয়েছিল"—

"বেশ নাও"—

টাকাটা বাহির করিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "কেমন যেন স্বপ্নের মতো পনেরটা দিন কেটে গেল! আহা, যদি সত্য হত—"

"স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় ? চললুম, আবার স্টুডিওতে দেখা হবে—"

চুণো দা—ওরফে চুণীলাল নামিয়া গেল।

চুণীলাল এবং পুঁটি উভয়েই অভিনেতা অভিনেত্রী। মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পুঁটি চুনীলালসহ গ্রামে গিয়া স্বামী স্ত্রীর অভিনয় করিয়া আসিল।

ট্রেণ চলিতেছে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় খোলা জানলার সামনে দিগন্তের দিকে চহিয়া পুঁটি একা বসিয়া আছে। মাথার চুল উড়িতেছে, শাড়িটা এলোমেলো হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই, নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে সে।

অনেক টাকা রোজগার করিয়াছে সে। বাড়ি গাড়ি সব হইয়াছে। অনেক শাড়ি, অনেক জামা, অনেক গহনা কিনিয়াছে, অনেক লোক তাহার পিছু পিছু ঘোরে। কিন্তু—

সহসা তাহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

ভদ্রলোক

ভদ্রলোকের বিবেকেই গলদ ছিল, তাহার উপর ট্রেনটা ছিল লেট্। তিনি হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রয়োজন ছিল না, তবু আরও কয়েক সেকেণ্ড ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঘড়িটার দিকেই চাহিয়া রহিলেন। ঘড়ি কোন সান্ত্বনা দিল না। প্ল্যাট্ফর্মের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন, কেহই আসে নাই। একটু আরাম বোধ করিলেন। ভদ্রলোকের সহিত মুখোমুখি হইয়া গেলে একটু অপ্রস্তুত হইতে হইত। ভদ্রলোক আর একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। ষ্টেশনে না আসিবার অসংখ্য কারণ থাকিতে পারে—ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নিশ্চয়ই নয়, হইতেই পারে না, কিন্তু যতীনবাবুকে ষ্টেশনে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি বেশ একটু আরাম বোধ করিলেন। কারণ তাঁহার বিবেকে একটু গলদ ছিল। বিবেকে যে গলদ আছে, তাঁহার আচরণ যে অশোভন হইতেছে, এতকাল তিনি যাহা ভাবিয়াছেন, লিখিয়াছেন, কার্যকালে যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছেন, একথা যতীনবাবু নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। চিঠিতে অবশ্য সে কথার আভাস পর্যন্ত দেন নাই, বুদ্ধিমান লোক তো কিন্তু মনে মনে হাসিয়াছেন নিশ্চয়ই। আবার তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, গৃহিণীর উপর রাগ হইল। উঁহারই প্ররোচনায় তিনি এই অপকর্মটি করিতে রাজি হইয়াছেন! সহধর্মিণী! হঠাৎ তাঁহার অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল 'কচু'! যে কুলিটি তাঁহার সুটকেসটি নামাইয়াছিল সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। কান দুইটি লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দাও—"

কুলি বলিল "ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না।"

"কেন?"

"রাত হয়েছে। এত রাত্রে ট্যাক্সি আজকাল থাকে না। তার উপর হাল্লা হয়েছে মেছুয়াবাজারে একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে নাকি—সব ভেগেছে তাই।"

"রায়ট্ ?"

"ঠিক জানিনা। রিক্সা, ঘোড়াগাড়ী পাবেন—"

ভদ্রলোকের ভ্রূযুগল আর একবার কুঞ্চিত হইল। ভাবিলেন, এই ওজুহাতে ফিরিয়া গেলে কেমন হয়!

"সাহেবগঞ্জে ফেরার ট্রেন কখন ?"

"সকালের আগে কোনও ট্রেন নেই" অর্থাৎ সমস্ত রাত ষ্টেশনে বসিয়া থাকিতে হইবে। সহধর্মিণী দাক্ষয়ণীর মুখটাও মনে পড়িল। ভারী মাংসল মুখ। ভদ্রলোক মত পরিবর্তন করিলেন। দাঙ্গা বা যুদ্ধ যা-ই হোক, হাওড়া পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া চলিবে না। গেলে দাম্পত্য-সৌধ-শীর্ষে বজ্রপাত হইবে। যদিও লাইট্নিং কণ্ডাক্টার আছে, ভিত্তিও বেশ মজবুত, তবু ভদ্রলোক সাহস করিলেন না।

কুলিটি তাঁহাকে একটি ঘোড়ার গাড়িতেই তুলিয়া দিয়াছিল। গাড়োয়ান প্রথমে কিছু বলে নাই, কিন্তু কলেজ ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোড জাংসানে গাড়োয়ানী ভাষায় ব্যক্ত করিল যে, সে শ্যামবাজার অভিমুখে যাইবে না, কারণ তাহার ঘোড়া দুইটি ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত হইয়াছে। সে তাহাদের এইবার বউবাজারে অবস্থিত আস্তাবলে লইয়া যাইতে চায়।

ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর নামিয়া পড়িলেন। ঘোড়ার দুঃখে বিগলিত হইয়া নয়, একটি রিক্সা দেখিয়া। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন, রাতদুপুরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া গাড়োয়ানের সহিত বচসা করা যে তাঁহার সাধ্যাতীত ইহা তিনি জানিতেন, রিক্সাটা আসিয়া পড়াতে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গাড়োয়ানের ভাড়া মিটাইয়া দিলেন। সোজা রিক্সায় উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রিক্সাওয়ালাও তেমন যেন উৎসাহ দেখাইল না। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভদ্রলোকের মুখে বেশ

ঘন কাঁচা-পাকা চাপদাড়ি, গোঁফও বেশ ঝাঁকড়া, ভ্রূ-দুইটি যেন দুইটি শুঁয়োপোকা। মাথায় বাব্‌রি। চেহারাটা বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ-ছাগলের মতো। ইহার উপর ভদ্রলোকের পরিধানে মোটা খদ্দরের জামা কাপড়। রিক্‌সাওলার বিশেষ দোষ নাই।

"কোথা যাবেন?" রিক্‌সাওলা প্রশ্ন করিল।

"হেদোর ধারে নামিয়ে দিলেই হবে।"

সুযোগ বুঝিয়াই হোক বা তাঁহাকে এড়াইয়া যাইবার জন্যই হোক, রিক্‌সাওলা বলিল,—

"দেড় টাকা ভাড়া লাগবে বাবু!"

"তাই দেব, চল!"

ভদ্রলোক উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রিক্‌সাওলা হঠাৎ মত পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

"আমার অন্য একটা সোয়ারি আছে বাবু, হেদুয়া পর্যন্ত যেতে পারব না।"

বলিয়া সোজা শিয়ালদহের দিকে ছুট দিল। ভাগ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা রিকসা পাইয়া গেলেন, তাহা না হইলে একটু বিপদে পড়িতে হইত। দ্বিতীয় রিক্‌সাওলাটিকে দেখিয়া তিনি ভরসা পাইলেন। বেশ গম্ভীর লোক—আট আনা চাহিল।

কিছুদূর গিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন "এ অঞ্চলে কোন দাঙ্গা হয়েছে না কি?"

"মেছোবাজারে ঘটেছিল একটা হাল্লা। কতকগুলো মাতালের কাণ্ড। এখন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে..."

ভদ্রলোকের সন্দেহ রহিল না যে, কিছু একটা ঘটিয়াছিল। তিনি রিক্‌সা হইতে অবতরণ করিয়া একটু মুশ্‌কিলে পড়িলেন। সুটকেশটি ফুটপাথে নামাইয়া বাড়ির দরজার কড়া নাড়িতে লাগিলেন। দরজা খুলিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল রিক্‌সাওলাকে দিয়াই সুটকেসটি ভিতরে বহন করাইবেন। কিন্তু কয়েকবার কড়া নাড়িয়াও যখন উত্তর পাইলেন না, তখন রিক্‌সাওলাকে ছাড়িয়া দিতে হইল। রিক্‌সাওলা চলিয়া গেলে

বাড়ির নম্বরটি আর একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। না, নম্বর ভুল হয় নাই। উপরের জানলা খুলিয়া গেল।

"কে ?—"

"আমি।—"

"আমি কে ? নাম বলুন—"

"যজ্ঞেশ্বর আইচ।"

"কি চান ?"

"যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করব।"

পূর্বেই বলিয়াছি ভদ্রলোকের বিবেকে গলদ ছিল। যতীনবাবুর সহিত এইবার অনিবার্যভাবে দেখা হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। তিনি একবার গলা খাঁকারি দিলেন। যে কোনও গলার আওয়াজ এমন কি নিজের গলার আওয়াজও বিপদের সময় মনে কিঞ্চিৎ বল-সঞ্চার করে। করিল। যতীনবাবুর সম্মুখীন হইবার জন্য সপ্রতিভতার ভান করিতে সক্ষম হইলেন। উপরের জানালা হইতে উত্তর আসিল—

"বাবা বাড়ি নেই।"

ভদ্রলোক একটু যেন আরাম বোধ করিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই সমস্যাটার অপর দিকটা মনে পড়াতে আবার একটু বিব্রতও হইলেন।

প্রশ্ন করিলেন—"তোমার মা কোথায় ?"—

"মাও বাবার সঙ্গে গেছেন।"

"কখন ফিরবেন ?—"

"তার ঠিক নেই। দু'তিনদিন দেরি হতে পারে। মামার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে গেছেন।"

"তুমি যতীনবাবুর কে হও ?"

"আমি তাঁর বড় মেয়ে। আমার কলেজ কামাই হবে বলে, আমাকে নিয়ে যাননি। আপনার কি দরকার বলে যান তিনি এলে তাঁকে বলব।"

"কপাটটা খোল তাহলে।"

"আপনাকে আমি চিনি না, কপাট খুলব কেমন করে ?..."

পাশের বাড়ীর ছাদ হইতে কে একজন প্রশ্ন করিলেন, "বিজলী, কার সঙ্গে কথা কইছিস ?"—

"কি জানি আমি চিনি না। কপাট খুলতে বলছেন।"

"খবরদার খুলিস নি। দাঁড়া আমি দেখছি—"

হঠাৎ একটা টর্চের আলো ভদ্রলোকের মুখে পড়ল।

"ওরে বাবা, এ যে চাপদাড়ি। টম্! টম্!—" পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড একটা অ্যালসেশিয়ান পাশের বাড়ির ছাদ হইতে উঁকি দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ট্যাক্সিও মোড় ঘুরিল। ভদ্রলোক আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"রোকো—"

উপরের জানলা হইতে শোনা গেল—

"বীরেন দা তোমার কুকুর ডেকে নাও। ছি, ছি, কি করছ তুমি—"

"যে রকম চেহারা। কিছু বলা যায় না।—" ট্যাক্সি চলিতে আরম্ভ করিল এবং ভদ্রলোক উঁহাদের কথাবার্তা আর শুনিতে পাইলেন না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘর্মাক্ত কপালটিকে মুছিয়া ফেলিলেন।

দিন চারেক পরে যতীনবাবু যজ্ঞেশ্বর আইচের নিকট হইতে যে পত্রটি পাইলেন তাহা এই—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

বিবাহের সময় মেয়েদের যে গরু ভেড়ার মতো করিয়া দেখা উচিত নয় এই মতবাদ আমি বহুকাল হইতেই পোষণ করিতেছি। তথাপি নিজের ভাবী পুত্রবধূকে ঘটা করিয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। সমুচিত শিক্ষা হইয়াছে। আপনাকে একটি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলাম, বোধ হয় সেটি পান নাই। ভালই হইয়াছে, পাইলে হয়তো আপনি থাকিতেন এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিজলীর চুল, দাঁত, নখ, রং, চেহারা দেখিয়া, তাহার গান শুনিয়া, সে কি কি

রান্না করিতে পারে তাহার ফর্দ লইয়া বিবেককে বলিদান দিয়া আসিতাম। আপনার হয়তো অসুস্থ আত্মীয়ের রোগশয্যাপার্শ্বে যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। পরমেশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তবু বিজলীকে আমি দেখিয়া আসিয়াছি, আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। আপনার সুবিধা মতো যে দিন স্থির করিবেন সেইদিনই তাহাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া আনিব। আমার নমস্কার জানিবেন। বিজলীর মামা কেমন আছেন জানাইবেন। আশা করি আশঙ্কার কিছু নাই। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীযজ্ঞেশ্বর আইচ

ঋণশোধ

ছকুর কাছে এসেছিলাম। আমার দিকে এক নজর চেয়েই ছকু বুঝতে পারল কেন এসেছি। প্রায়ই আমাকে আসতে হয় এবং একই উদ্দেশ্যে আসতে হয়। ছকুর কাছে কিছু টাকা পাব, কিন্তু কিছুতেই সেটা পাচ্ছি না। প্রথম প্রথম দু'চারবার তাগাদা করেছিলাম, এখন আর তাগাদাও করি না। নিজেরই চক্ষুলজ্জা হয়। তবে আসি রোজ। তার দোকানটিতে বসে' খবরের কাগজটি পড়ি, রাজনীতি নিয়ে দু'চারটে টুকরো আলাপ করি, আর মনে মনে প্রত্যাশা করে থাকি : হয়তো ছকুই নিজে থেকে ঋণশোধের প্রসঙ্গটা তুলবে। কিন্তু তোলে না। ঘড়িতে টং টং করে' ন'টা বাজলে ছকু হাই তুলে টুস্‌কি দিয়ে সামনের দেওয়ালে রক্ষিত গণেশকে প্রণাম করে' দোকান বন্ধ করবার আয়োজন করে। আমিও উঠে বাড়ী চলে যাই। আবার তার পরদিন সন্ধ্যায় এসে হাজির হই। এমনি বহুকাল ধরে' চলছে। ব্যাংক থেকে করকরে পাঁচশ' টাকা বার করে' আমিই একদিন ছকুর এই ঘড়ির দোকানটি করে' দিয়েছিলাম।

বি, এ, ফেল করে' বাড়িতে বসেছিল বেচারা, নানারকম চেষ্টা করে' কোথাও কিছু জোগাড় করতে পারছিল না, আমিই তাকে পরামর্শ দিই—"এ শহরে ভালো ঘড়ির দোকান নেই, তুমি একটা ঘড়ির দোকান কর। আগে ঘড়ি সারাতে শিখে এস, তারপর বাজারের মাঝখানে একটা ঘর ভাড়া করে' বসে যাও, কিছু কিছু হবেই।" ছকু হেসে উত্তর দিয়েছিল—"তা কি আমি জানি না, কিন্তু ক্যাপিটাল পাচ্ছি কোথায়!" হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে আমি বলে' বসলাম, "যা ক্যাপিটাল লাগে আমি ধার দেব তোমাকে, তুমি লেগে পড়!"

ছকু লেগে পড়ল। আমার চেনা-শোনা এক ঘড়ির কারিগর ছিল কোলকাতায়। তার নামে একখানা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ছকুকে। ছকু কোলকাতায় গিয়ে প্রায় বছরখানেক রইল। থাকবার কোনও অসুবিধা হয় নি, ছকুর এক পিসেমশায় চাকরি করতেন খিদিরপুরে। তাঁর স্কন্ধারূঢ় হ'য়ে ঘড়ি সারানো বিদ্যেটা আয়ত্ত করে' ফেললে সে। তারপর আমাকে একদিন এসে বললে "এইবার ক্যাপিটাল দিন। বাজারের ঠিক মাঝখানে ভালো ঘর খালি হয়েছে একটা। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে আজই ওটাকে 'বুক' করে' ফেলি, কিছু আসবাব পত্রও কিনতে হবে, ভাঙা ঘড়ি জোগাড় করেছি কয়েকটা, আপনার ঘরে যে দেওয়াল ঘড়িটা আছে সেটাও আমি দোকানে টাঙাব, আপনার একটা 'টাইম্‌পীস' তো রয়েছে, নতুন ঘড়িও কিনতে হবে দু'চারটে, ঘড়ির ব্যাণ্ড, কাচ, এসব-ও চাই"...হড়হড় করে' বলে' যেতে লাগল।

আমি একটু ভীত হ'য়ে পড়ছিলাম। বেশী টাকা তো আমার নেই, রিটায়ার করেছি প্রভিডেন্ট ফণ্ডটুকুই সম্বল। বললাম, "আমি শ' দুই টাকার বেশী দিতে পারব না, ওতেই কুলিয়ে নাও এখন।" ছকু চক্ষু দুটি কপালে তুলে বলল—"আপনি ক্ষেপেছেন না কি! বিড়ির দোকান নয়, ঘর ঘড়ির দোকান! অন্তত হাজার খানেক টাকা ক্যাপিটাল না পেলে আরম্ভই করা যাবে না যে, পরে আরও লাগবে। এই দেখুন না লিষ্ট—"। আমি লিষ্ট দেখি নি। বলেছিলাম, "দেখ হাজার টাকা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। খুব মেরে কেটে পাঁচ শ' টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারি।" ছকু চোখ বড় বড় করে' নাক ফুলিয়ে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ আমার দিকে। তারপর বললে—"আপনি শেষে এমনভাবে বিট্রে (betray) করবেন জানলে আমি সাউথ আফ্রিকায় সেই চাকরিটা নিয়েই চলে' যেতাম।" সাউথ আফ্রিকায় কোনও চাকরি অবশ্য সে পায়নি, খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন দেখে দু'একদিন জল্পনা করেছিল মাত্র যাবে কি না। পাঁচশ' টাকাতেই রফা হল শেষ পর্য্যন্ত। ছকু ঘড়ির দোকান করে' ফেললে। এ প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার কথা। দোকান নিশ্চয়ই ভালো চলছে। কারণ যে

স্টাইলে সে থাকে তাতে মনে হয় টাকাকড়ি রোজগার করে' নিশ্চয়। তা' না-হলে অত সিগারেট, অত সিনেমা অমন ছিম্‌ছাম হয়ে থাকা সম্ভব হ'ত না। চার পাঁচ রকম জুতোই পায়ে দেয়। এক জামা কখনও দু'দিন পরে না সে উপর্য্যুপরি। সুতরাং মনে হয় দোকান মন্দ চলছে না। আমাকে কিন্তু একটি পয়সা দেয় নি এখনও পর্যন্ত। আমি কিন্তু প্রায়ই যাই সন্ধ্যার পর। বসি খানিকক্ষণ। আশা করে' থাকি ছকু নিজেই হয়তো কথাটা তুলবে, কিন্তু তোলে না। আগেই বলেছি এখন আর মুখ ফুটে তাগাদা করতে পারি না, মনে মনে করি। কিন্তু সেদিন যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম এবং ছকুর মুখে তার যে ইতিহাস-সম্মত ব্যাখ্যা শুনলাম তাতে আশা ছাড়তে হ'ল।

দোকানের কোণটিতে বসে' রোজ যেমন করি সেদিনও তেমনি খবরের কাগজ খুলে কোরিয়া এবং লাল-চীন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, এমন সময়ে একটি ছেলে দোকানে এসে ঢুকল। তার হাতে একটি ঘড়ির বাক্স।

"ছকু বাবু, এই রিস্ট ওয়াচটি বদলে দিতে হবে। এর পিছন দিকে একটা দাগ রয়েছে, তখন লক্ষ্য করে' দেখিনি, এই দেখুন—"

ছেলেটি বাক্স থেকে রিস্ট ওয়াচটি বার করে' দেখালে। পিছন দিকে সত্যিই একটা আঁচড়ের মতো দাগ ছিল।

ছকু মৃদু হেসে বললে—"সরি, এখন আর বদলে দিতে পারব না। নেবার সময় আপনার দেখে নেওয়া উচিত ছিল!"

ছেলেটি একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

"তা অবশ্য ছিল, আমার দোষ হয়েছে সেটা। কিন্তু বিশ্বাস করুন ওটা, মানে ওই দাগটা, আপনার দোকান থেকেই হয়েছে। আমরা কেউ হাতও দিই নি ও ঘড়িতে, আজ হঠাৎ উল্টে দেখি—"

ছকু নির্বিকারভাবে উত্তর দিলে—"বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন প্রিন্সিপ্‌লের। জিনিস নেবার সময় সেটা ভালো করে' দেখে না নিলে উভয়তই মুশকিল। মাপ করুন আমাকে। পিছন দিকে ওটুকু দাগ থাকলে ক্ষতিই বা কি।"

"এমনিতে কোনও ক্ষতি ছিলনা, কিন্তু বিয়ের উপহার কি না, দাগী জিনিস দেওয়া যাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমিই ব্যবহার করব, আমাকে আর একটা দিন—"

ছকু তাকে আর একটি ঘড়ি বিক্রি করলে। ছেলেটি এবার উল্‌টে পাল্‌টে ভাল করে' দেখে নিয়ে চলে' গেল।

আসল কথাটি আমি জানতাম। ঘড়িটা কোলকাতা থেকে ছকু যখন এনেছিল তখন ছকুই দেখিয়েছিল আমাকে দাগটা। বলেছিল—"এই দাগটুকুর জন্যে দাম পাঁচটাকা কম দিয়েছি। কিন্তু দেখবেন ঠিক কাউকে ক্যাটালগ প্রাইসে ঝেড়ে দেব—"

ছোকরাটি চলে গেলে ছকু উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে চাইলে আমার দিকে। আমি কেবল দু'টি মাত্র কথা বললাম—"অন্যায় করেছ"।

ছকু ইতিহাসের ছাত্র। সে ইতিহাসের নজীর তুলে বললে—"ব্যবসার সঙ্গে যুদ্ধের যে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা যদি মানেন তাহলে কিছুই অন্যায় করি নি। জিতেছি এইটেই আমার সবচেয়ে বড় যুক্তি। এভ্‌রিথিং ইজ ফেয়ার ইন্ ওয়র এণ্ড লাভ্—"

"ব্যবসার সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক কি, ঠিক বুঝলাম না।"

"ইতিহাস পড়লেই বুঝতে পারবেন। আজকালকার যত যুদ্ধ তার মূলে আছে ব্যবসা। পুরাকালেও তাই ছিল। ক্রুজেডাররা ধর্মের জন্য যুদ্ধে নামে নি, নেমেছিল বাণিজ্যপথ দখল করবার জন্য। আমার মতে ব্যবসাটাই যুদ্ধ। খদ্দের হ'ল শত্রুপক্ষ, যে কোনও প্যাঁচে ফেলে তার পকেট থেকে পয়সাগুলো কেড়ে নিতে হবে। মিষ্টি কথা বলে', পিঠে হাত বুলিয়ে, লোভ দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে যেমন করে' হোক—"

ছকুর বিদ্যাবত্তা আর চিন্তাশীলতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ছকু উত্তেজিত হয়েছিল, সে বলেই যেতে লাগল—"এই হালের কথাই ধরুন না। ইংরেজরা যখন প্রথমে এদেশে এসেছিল তখন তাদের ব্যবসা বুদ্ধি ভালো ছিল, তাই তারা এদেশে রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিল। ক্লাইভ উমিচাঁদকে

লাল-কাগজ শাদা-কাগজের ভেল্‌কি দেখিয়ে ঠকিয়েছিল, হেস্টিংস নন্দকুমারকে ফাঁসী দিয়েছিল, আরও কত কি করেছিল। অর্থাৎ তখন তারা খাঁটি ব্যবসাদার ছিল। তাই শুধু ব্যবসা নয়, এত বড় সাম্রাজ্যও স্থাপন করতে পেরেছিল। কিন্তু এদেশে কিছুদিন থাকবার পর এদেশের জল হাওয়ার ফল ফলল। জল হাওয়ার গুণ যাবে কোথা, মহৎ হ'য়ে উঠল ব্যাটারা। তাদের ব্যবসাদারগুলো পর্য্যন্ত মহৎ হ'য়ে উঠল। বছর তিনেক আগের একটা ঘটনা বলছি শুনুন, আমার পার্সোনাল এক্‌স্‌পীরিয়েন্স। ঘটনাটা এতদিন কাউকে বলিনি। মল্লিকদের বাড়ির বিয়ের কথা মনে আছে আপনার? সেই যে কোলকাতা থেকে শানাই এসেছিল? ঘেঁটু মল্লিকের মেয়ের বিয়ে—"

"মনে আছে"—

"আমি তখন কোলকাতায়। ঘেঁটু মল্লিক আমাকে চিঠি লিখলে: 'ভাই, তুমি জামাইয়ের জন্য ভালো দেখে একটি রিস্টওয়াচ কিনে এনো। পাঁচশো টাকা পর্য্যন্ত দাম দিতে রাজি আছি। ঘড়িটি সোনার হওয়া চাই।' একটা নামজাদা সায়েবী দোকানে গিয়ে খুব ভাল ঘড়ি একটা কিনে ফেললাম। দোকানের নামটা আর বলব না, নামটা প্রকাশ করতে চাই না। ঘড়িটা কেনবার পর আরও দু' তিন দিন কোলকাতায় থাকতে হয়েছিল আমাকে। কি যে দুর্ব্বুদ্ধি হল ঘড়িটা হাতে পরে বেড়াতে লাগলাম। শ্যামবাজারে নকুদের বাড়ী গেছেন আপনি? তাদের বৈঠকখানার ফ্যানটা দেখেছেন? এমন নীচু করে' টাঙানো যে কোনও লম্বা লোক যদি হাত তোলে হাতে ব্লেড ঠেকে যায়। আমি জানেনই তো ছ'ফুট দু'ইঞ্চি। নকুদের বাড়ী গেছি, বন্‌ বন্‌ করে' ফ্যান্‌টা ঘুরছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইতে কইতে হাতটা তুলেছি—বাস্‌! ব্লেড্‌ লেগে ঘড়ির কাচটা চুরমার, কাঁটাও একটা ভেঙ্গে গেল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়লাম খানিকক্ষণের জন্য। পাঁচশ' টাকা দিয়ে নতুন ঘড়ি কিনে দেবার সামর্থ্য নেই আমার, কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ভাঙা ঘড়িটা ঘড়ির বাক্সে পুরে ক্যাশ্‌মেমোটা নিয়ে হাজির হলাম সেই ঘড়ির দোকানে গিয়ে। দেখা করলাম বড় সাহেবের সঙ্গে। বললাম আমি

এই ঘড়িটা যখন নিয়ে গিয়েছিলাম তখন দেখে নিইনি, আজ খুলে দেখছি ঘড়িটা ভাঙা। যদি কাইণ্ডলি বদলে দেন, এটা ম্যারেজ প্রেজেণ্ট। সাহেব কয়েক সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, চোখের উপর পাতা দুটো উঠল-পড়ল বার কয়েক, তারপর বললেন—'আপনি দেখে নেন নি? ও আচ্ছা, বসুন।' টং করে, ঘণ্টা বাজালেন, কর্মচারী এল একজন। সাহেব তাকে বললেন—'এই ঘড়িটা বদলে নিয়ে আসুন।' নতুন ঘড়ি নিয়ে সাহেবকে অনেক ধন্তবাদ দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝলাম ব্যাটাদের মরণ এবার ঘনিয়ে এসেছে। এইবার চাটিবাটি গুটিয়ে সরে পড়তে হবে। পড়তেও হল। মহাত্মাজি যেই কুট্ করে বললেন: কুইট্ ইণ্ডিয়া অমনি সুট সুট করে চলে যেতে হ'ল—"

ছকুর ব্যবসা-নীতি এবং ইতিহাস-বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে সেদিন আমার দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল আমার টাকা আর ফেরত পাব না। ছকু কিন্তু আমার ঋণ শোধ করেছিল, যদিও একটু তির্য্যক পথে। একদিন ছকুর বাড়িতে গিয়ে দেখি বাদল স্যাকরা বসে' আছে। প্রশ্ন করলাম—এখানে কেন? সে বলল, ছকুবাবুর স্ত্রীর জন্ত একটা হার গড়িয়ে এনেছি। হারটি আমাকে দেখালে সে। বেশ ভাল হার।

"দাম কত পড়ল?"

"পাঁচ-শো টাকা"—

"টাকাটা পেয়ে গেছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করলাম। আমি না পেলেও আমার মেয়ে তো পেল পাঁচ-শো' টাকা। গল্পের রস হানি হবে বলে' আগে বলি নি ছকু আমার জামাই।

ভেক

পিওন ডাক দিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নূতন প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষ মহাশয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি একটি শুভ-সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। আগামীকল্য তাঁহার কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ, আমি যেন শুভকার্যে যোগদান করিয়া তাঁহাকে বাধিত করি। প্রতিশ্রুতি দিলাম, বাধিত করিব। ঘোষ মহাশয় চলিয়া গেলেন। তখন ডাকের চিঠিগুলি খুলিতে লাগিলাম। প্রতিদিন ডাকে একটি না একটি কৌতুকজনক পত্র থাকে, সেদিনও ছিল। যাঁহারা সাহিত্য-চর্চা করেন, তাঁহাদের ইহা অবিদিত নাই যে, সাহিত্য-জগতে এমন কতকগুলি জীব বিচরণ করেন যাঁহারা নিজেরা সাহিত্যিক নহেন, কিন্তু সাহিত্য ও সাহিত্যিকই যাঁহাদের সব। ইহাদের ঠিক শ্রদ্ধা করা যায় না, এড়ানোও যায় না। সাহিত্যিকদের নানারূপ সঙ্গত-অসঙ্গত, ফাই-ফরমাস ইহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে খাটেন বলিয়া অনেক সময় ইহাদের সঙ্গ অপরিহার্য হইয়া পড়ে, অনেক সময় ইহারা স্নেহভাজনও হন। শ্রীমান রাইমোহন মাইতি আমার জীবনে এইরূপ একটি লোক। রাইমোহন লিখিতেছে—

শ্রীচরণেষু

দাদা, নূতন একটি কবির সন্ধান পেয়েছি। আমার মনে হয়, এঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এঁর দুটি কবিতা এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমার বিশ্বাস আপনার ভাল লাগবে। যদি কোনও পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন ভাল হয়। আজকাল ভাল কবিতা তো চোখেই পড়ে না। মনে হয়, যে কোন সম্পাদক এ দুটি পেলে লুফে নেবেন। ইনি 'ভেক' এই ছদ্মনামে লিখতে চান। আপনার অমূল্য সময় আর নষ্ট করব না। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি,

প্রণত—রাইমোহন মাইতি।

এইবার কবিতা দুইটি শুনুন।—

সাগরের প্রতি

আমার মনের গোপন কথাটি জেনেছ তুমি
অথচ বল না কিছু
তোমার না-বলা-কথা-আলেয়ারে ধরিব বলি
ফিরি তার পিছু পিছু।
ধরিতে পারি না, ঠিকানা জানি না তার
আনমনে শুধু ঘোরাটাই হয় সার
ফুলেরা পাখিরা সূর্য-তারারা
আসে যায় বার বার
পথের চেহারা কভু সমতল,
কভু উঁচু, কভু নীচু।
অনেক আকাশ নেমেছে নেমেছে
অনেক সাগর-কোলে
তাদের মিতালি আমার শিথানে
নিদালি স্বপনে দোলে।—"ভেক"

কূপের প্রতি

তোমার মনের গোপন কথাটি জেনেছি আমি
তবু আছি নিশ্চুপ
দেখিতেছি শুধু নীরব বেদনে আপন মনে
জ্বলিছে মৌন ধূপ।
সাগরে ভাসিবে ময়ূর-পংখী মোর
তাহারই আশায় কত নিশি ভোর
জাগর-নয়নে নিদ নাহি নামে
সাগর যে মন-চোর।

তুমি তারে ওগো কেন চাও বল
তুমি যে ক্ষুদ্র কূপ।
আমি যে ভূধারী, আমি যে দিশারী
আমি যে তাতল তট
বুলবুলি-চরা মাঠে মাঠে আমি
গড়ি যে প্রেমের মঠ।—"ভেক"

কবিতা দুইটি বার দুই পড়িয়া রাখিয়া দিলাম। কাহাকে যে উল্লিখিত রত্নযুগল লুফিয়া লইবার সুযোগ দিব, সহসা ঠিক করিতে পারিলাম না।

পরদিন সকালে স্বয়ং রাইমোহন আসিয়া উপস্থিত। সে যে কলিকাতা হইতে সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইবে প্রত্যাশা করি নাই।

"কি রাইমোহন, হঠাৎ এসে পড়লে যে?"

"যে কবিতা দুটো পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন?"

"পেয়েছি।"

"কোথাও পাঠিয়েছেন নাকি?"

"না।"

"যাক, বাঁচা গেল। কোথাও পাঠাতে হবে না, কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিন।"

"কেন, ব্যাপার কি?"

"যত সব বোগাস্—"

একবার শিস দিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর মাথার সামনের দিকের লম্বা চুলের গোছাটা দক্ষিণ মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। বুঝিলাম, যে কারণেই হোক, ছোকরা বেশ বিচলিত হইয়াছে।

"ব্যাপার কি বল তো?"

"বলছি। কিছু খাওয়ান, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। শেষ মুহূর্তে যখন খবর পেলাম, ছুটে ট্রেন ধরেছি। পয়সাও বেশি ছিল না সঙ্গে। সমস্ত রাত অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে—"

"চাকরকে ডাকিয়া চা ও খাবার আনিতে বলিলাম।"

"ব্যাপারটা কি বল দেখি ?"

"পরশু পর্যন্ত আমাকে যা চিঠি লিখেছে, এখনও সঙ্গে আছে আমার, বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখুন আপনি—"

"কে চিঠি লিখেছে ?"

"ওই ভেক ভেক, যার কবিতা আপনাকে পাঠিয়েছি। ও শেষে কুয়ার ভেতরই লাফিয়ে পড়ল। আপনারই পাশের বাড়িতে আছে তো। নিমন্ত্রণ-পত্র পান নি ?"

এতক্ষণে যেন কিঞ্চিৎ আলোক দেখিতে পাইলাম।

"ভেক মেয়েছেলে নাকি ?"

"হ্যাঁ, বিনোদিনী। এম, এ পাস, মার্জিত রুচি, কিন্তু বিয়ে করছে কাকে জানেন ? একটা নন্-ম্যাট্রিক জরদ্গবকে—"

"কেন ?"

"ক'লকাতায় তার সাতখানা বাড়ি আছে। মিলও আছে একটা। ছি ছি, এতটা আশা করি নি। করা সম্ভব ? আপনিই বলুন। আমাকে পরশু পর্যন্ত যে চিঠি লিখেছে, দেখুন আপনি—"

"তা না হয় দেখব। কিন্তু আমি—।" থামিয়া গেলাম। কারণ আবার সে শিস দিবার চেষ্টা করিল, আবার চুল মুঠা করিয়া ধরিল। ধৃত-কেশ অবস্থায় নত-মস্তকে বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার রকম-সকম দেখিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়।

"ব্যাপারটা কি, বল দেখি খুলে। হঠাৎ এলে কেন তুমি ?"

"ট্র্যাজেডিটা স্বচক্ষে দেখব ব'লে এলাম। গ্রিম্ ট্র্যাজেডি। উঃ!"

আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কূপের খবর পাইয়াছিলাম। এইবার সাগরের খবর পাইলাম। প্রশান্ত মহাসাগর নয়, বঙ্গোপসাগর।

নারীর মন

সুমিতা ঘরে এসে সুইচ টিপল, কিন্তু আলো জ্বলল না একটু বিব্রত হয়ে পড়ল বেচারী। বাল্‌বটা ফিউজ্‌ড হ'য়ে গেল না কি? হাতে একটিও পয়সা নেই, মাইনে পেতে এখনও দিন পাঁচেক দেরি আছে। অথচ আলো একটা না হলেও চলবে না। নবেন্দু থাকলে তার কাছ থেকে কিছু ধার চাওয়া যেত। কিন্তু সে-ও তো আজ বাড়ি চলে গেল। দুপুরে দেখা করতে এসেছিল, তখনই যদি চেয়ে বাখত। কথাটা মনে হয়েছিল কিন্তু চাইতে লজ্জা করল। কেন লজ্জা করল? নবেন্দু তাকে ভালবাসে, চাইলে সে খুশীই হ'ত হয়তো, তবু কিন্তু চাইতে পারে নি। কেন? নবেন্দু যদি তার স্বামী হ'ত তাহলে এ সঙ্কোচ নিশ্চয়ই হ'ত না। অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে তার মনে হল নবেন্দু তাকে বিয়ে করবে কি? কই, কোন দিন তো মুখ ফুটে কিছু বলে নি। সঙ্গে সঙ্গে সুরেনের কথাও মনে পড়ল। সুরেনও আসে তার কাছে। তারও ভাব-ভঙ্গী থেকে মনে হয় সে-ও যেন তাকে চায়, কিন্তু সে-ও মুখ ফুটে বলে নি এখনও।

…অন্ধকার ঘরে একা দাঁড়িয়ে নিঃস্ব সুমিতা বড় অসহায় বোধ করতে লাগল। সে রোজগার করে, মাসে ষাট টাকা মাইনে পায়। কিন্তু কিছুতেই কুলোতে পারে না ওই ক'টা টাকায়। সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে, ভাল শাড়ি দেখলে লোভ সামলাতেই পারে না। তুচ্ছ পাথরের একটা হার, তাই কিনতেই দশটা টাকা বেরিয়ে গেল সেদিন। বুঝতে পারে অন্যায় করছে কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারে না কিছুতে। ওই হারটা না কিনলে মাসের শেষে এমন নিঃস্ব হ'য়ে পড়তে হত না। যদি একজন সঙ্গী থাকত তাহলে দু'জনের রোজগারে স্বচ্ছন্দে চ'লে যেত জীবন। অন্ধকারে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল সুমিতা। এমন পয়সা নেই যে একটা মোমবাতি কিনে আনে? একটা

বোর্ডিংয়ে খায় সে, মাইনে পেলে তাদের টাকা দিয়ে দেয়। একটা মনোহারী দোকানের সঙ্গে চেনা আছে, তারা মাঝে মাঝে তাকে স্নো পাউডার ধারে দিয়েছে, তাদের কাছে মোমবাতি পাওয়া যাবে কি? হঠাৎ চমকে উঠল সুমিতা। দুয়ারে কে কড়া নাড়ছে। সুরেন নিশ্চয়। কিন্তু এই অন্ধকার ঘরে সুরেনকে ডেকে আনা কি ঠিক হবে? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। কোন সাড়া দিলে না। কড়া কিন্তু সমানে নড়ে চলেছে। শেষে ডাকও শোনা গেল।

"সুমিতা, সুমিতা, ঘুমিয়ে পড়লে না কি—!"

সুরেনের গলা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সুমিতা। কপাট খুলে বললে—

"ও, তুমি এসেছ। আমি বেরুচ্ছি একটু—"

"কোথায়—?"

"এই এমনি বেড়াতে—"

"চল, আমিও যাই। আমি তোমার সঙ্গে গল্প করবার জন্যেই এসেছিলাম—"

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

সুমিতা বললে—"আমার কাছে কিন্তু একটিও পয়সা নেই, হাঁটতে হবে—"

"আমার কাছে আছে। চল মাঠেই যাওয়া যাক—"

একটা ট্রামে উঠে বসল দু'জনে। সুমিতার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল লজ্জায়। কেন সে সুরেনের পয়সায় ট্রামে চড়ল? কেন সে তাকে বলতে পারল না যে আমি হেঁটেই যাব, আমার সান্নিধ্য তোমার যদি কাম্য হয় হেঁটেই চল আমার সঙ্গে। কেন একথা সে বলতে পারল না! পারেনি বলে কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল সে মনে মনে। মনে হল বরাবরই কাঙালিনীর মতো নিজের অজ্ঞাতসারেই কোন না কোন পুরুষের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে আছে সে মনে মনে। এই একটু আগে যে জীবনসঙ্গীর কথা সে ভাবছিল সে তার এই কাঙাল মনোবৃত্তিরই সৃষ্টি।...

"চল এবার নাবা যাক—"

মাঠে এসে পড়েছিল তারা। একটা নির্জন জায়গায় গিয়ে পাশাপাশি বসল দুজনে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সুরেন গলা-খাঁকারি দিয়ে বললে—

"আজ একটা কথা বলব বলে এসেছিলাম—"

"কি কথা ?"

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই—"

সুমিতার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল। তবু কিন্তু স্থির হয়ে বসে রইল সে। তারপর আত্মসম্বরণ করে ধীর কণ্ঠে বললে,

"আমি যতদিন পর্যন্ত ভালভাবে রোজগার করতে না পারি ততদিন বিয়ে করব না ঠিক করেছি। কারো গলগ্রহ হবার ইচ্ছে আমার নেই—"

"স্ত্রী কি কখনও স্বামীর গলগ্রহ হয় ?"

"হয়—"

সুরেন অনেক রকম যুক্তির অবতারণা করে' বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুমিতা কিছুতেই বুঝল না। আত্মসম্মানের যে তুঙ্গশিখরে সে সহসা নীত হয়েছিল সেখানে সুরেন তার নাগাল পেল না কিছুতে। হেঁটেই বাড়ি ফিরল সে। বাড়ি ফিরে অন্ধকার ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে কাঁদতে লাগল। আবার দুয়ারে কড়া নড়ল একটু পরে।

"কে—?"

"আমি নবেন্দু—"

"আমার ঘরের আলোটা ফিউজ্‌ড্‌ হয়ে গেছে। শুয়ে পড়েছি আমি—"

"কপাট খোল। আমি বাল্‌ব এনেছি—"

আশ্চর্য হয়ে গেল সুমিতা। নবেন্দু কি করে জানলে যে তার 'বাল্‌ব'টা ফিউজ্‌ড্‌ হয়ে গেছে! কপাট খুলে সেই প্রশ্নই করল সে।

"দুপুরে তুমি যখন চান করবার জন্যে বেরিয়ে গেলে তখন আমিই তোমার ভাল বাল্‌ব'টা খুলে নিয়ে তার জায়গায় ফিউজ্‌ড্‌ বাল্‌ব লাগিয়ে দিয়েছিলাম একটা—"

"সে কি ! কেন—?"

"সুরেনকে ঠকাবার জন্যে। ভাবলাম ঘর অন্ধকার দেখলে সে হয়তো বসবে না—"

সুমিতার কর্ণমূলে অরুণিমা দেখা দিল।

"কেন, এলোই বা সুরেন ! তোমার তাতে আপত্তি কিসের ?—"

"ঘোর আপত্তি। সে তোমাকে বিয়ে করবার তালে আছে। তোমার সঙ্গে তাকে একলা থাকবার সুযোগ কি আমি দিতে পারি ?—দাঁড়াও আলোটা লাগিয়ে দিই—"

টর্চের সাহায্যে বাল্‌ব্‌টা লাগিয়ে দিলে নবেন্দু।

সুমিতা মুচকি হেসে বললে—"সুরেনের সঙ্গে মাঠে গিয়েছিলাম। বিয়ের প্রস্তাব সে করেছে—"

"তাই নাকি ! তুমি কি উত্তর দিলে—"

"বলেছি যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো রোজগার করতে না পারছি ততক্ষণ বিয়ে করব না। আমি স্বামীর গলগ্রহ হতে চাই না—"

"বেশ বলেছ !—কিন্তু—"

বিবর্ণ মুখে চুপ করে গেল নবেন্দু। তারপর মুখে হাসি টেনে এনে বলল—

"কিন্তু আমাকেও কি তুমি ওই উত্তর দেবে ?"

সুমিতা বলতে পারলে না, 'দেব—'। সহসা বিপর্যয় ঘটে গেল তার মনে। বললে—

"তা জানিনা। রাত হয়েছে, বাড়ি যাও তুমি !"

তারপর হেসে ফেললে।

সাঁতারের পোষাক

আমি মফঃস্বল হইতে যখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িতে গেলাম তখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী মহলে সাঁতার শেখার হুজুক খুব প্রবল। হেদুয়া পুষ্করিণী প্রত্যহ সকালে-বিকালে সাঁতারুদের এবং সন্তরণ-দর্শনার্থিদের কলরবে মুখরিত। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত হুজুকে মাতিয়াছেন। আমারও বাসনা হইল সাঁতার শিখি। বন্ধুবর নগেন্দ্র হেদুয়ার সাঁতার-ক্লাবের একজন সভ্য। তাহারই শরণাপন্ন হইলাম। সে বলিল, "এ তো খুব ভাল কথা। কালই তোকে ক্লাবে নিয়ে যাব। তুই সাঁতার একেবারে জানিস না?"

"জানি। কতবার গঙ্গা পার হয়েছি। সাঁতার জানি বই কি—"

"বাঃ। তোকে পেয়ে আমাদের ক্লাবের লাভই হবে তাহলে। শান্তিদা তোকে লুফে নেবে একেবারে। আসছে বছর আমরা লম্বা একটা রেসে নাবব শান্তিদা বলছিলেন। তোর সুইমিং কস্টুম আছে?"

"না।"

"কিনতে হবে একটা। চৌরঙ্গীর একটা সাহেবী দোকানে নানারকম ভালো ভালো কস্ট্যুম এসেছে শুনেছি। কাল নিয়ে যাব তোকে।"

হেদুয়া ক্লাবে ভরতি হইয়া গেলাম। আমার সাঁতার দেখিয়া শান্তিদা খুব সন্তুষ্ট হইলেন।' তিনিও অবিলম্বে একটি সুইমিং কস্ট্যুম কিনিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন।

নগেনের সঙ্গে সেই দিনই বৈকালে গেলাম চৌরঙ্গীর সেই দোকানে। নগেনের সমস্তই জানা-শোনা ছিল, যেখানে গেলে সুইমিং কস্ট্যুম পাওয়া যাইবে, সেইখানেই সে আমাকে লইয়া গেল। কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল একটি রূপসী তরুণী। অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু যে কস্ট্যুম সে বাহির করিয়াছিল নগেনের তাহা পছন্দ হইল না।

"এ ছাড়া অন্য কোন রকম নেই ?"

"আছে বই কি।"

ঘাড় দুলাইয়া মুচকি হাসিয়া তরুণী চলিয়া গেল এবং আর এক রকম বাহির করিয়া আনিল। এটাও নগেনের পছন্দ হইল না, আমারও হইল না।

"আর কিছু নেই ?"

"আছে।"

সে আর একবার ভিতরে গেল এবং তৃতীয়প্রকার কস্ট্যুম আনিল। বলিল, "এটা বিশেষ রকম মজবুত সুতায় প্রস্তুত। অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারুদের খুব প্রিয়।"

কিন্তু গেঞ্জির কলারটা বড় বেশী লম্বা। পছন্দ হইল না।

"আরও দেখাচ্ছি আপনাদের।"

সুমিষ্ট হাসিয়া মেয়েটি আবার ভিতরে চলিয়া গেল এবং এবার একসঙ্গে চার পাঁচ রকম কস্ট্যুম বাহির করিয়া আনিল। একটাও পছন্দ হইল না।

"আর নেই ?"

"আছে বই কি। প্লীজ ওয়েট্ এ মিনিট—"

আবার সে দ্রুতপদে ভিতরে গেল, আবার একগোছা বাহির করিয়া আনিল। কিন্তু নগেনের পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ড এমনি সূক্ষ্ম যে, এবারও একটাও পছন্দ হইল না। কোনটার কলার ছোট, কোনটার বড়, কোনটার রং খারাপ, কোনটার বুনোট ভালো নয়, কোনটার হাতা ঢিলা, কোনটার বেশী টাইট্। কস্ট্যুম স্তূপীকৃত হইয়া গেল।

"আর নেই ?"

"বাইরে আর নেই। ওয়েট্ এ বিট্—আজ নতুন একটা চালান এসেছে, তাতে হয়তো থাকতে পারে।"

মধুর হাসিয়া তরুণী আবার চলিয়া গেল। এবার সে যে-কস্ট্যুমগুলি লইয়া আসিল, সেগুলি বাস্তবিকই চমৎকার। আমাদের দু'জনেরই খুব পছন্দ হইল।

"দাম কত ?"

"বেশী নয়। পাঁচ টাকা চোদ্দ আনা।"

এইবার একটু মুশকিলে পড়িতে হইল। আমাদের কাছে পাঁচ টাকার বেশী ছিল না। গলা খাঁকারি দিয়া নগেন বলিল, "আমাদের কাছে পাঁচ টাকা মাত্র আছে। ভেবেছিলাম পাঁচ টাকাতেই হয়ে যাবে। এইটেই কিন্তু আমাদের চাই। কাইণ্ডলি এটা একটু আলাদা করে রেখে দিন। এখনি এসে নিয়ে যাব আমরা।"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "ও ইয়েস্! আলাদা প্যাকেট করে রেখে দিচ্ছি—"

লজ্জায় মাথা কাটা যাইতেছিল। পর-মুহূর্তেই আমরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

নগেন বলিল, "এখনই এসে নিয়ে যেতে হবে ওটা।"

"নিশ্চয়ই!"

সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে চলিতেছিলাম, হঠাৎ 'বাবু বাবু' ডাক শুনিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতে হইল। দেখিলাম একটি চাপরাশি গোছের লোক হাতছানি দিয়া আমাদেরই ডাকিতেছে। দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

"আপনারাই কি সুইমিং কস্ট্যুম কিনছিলেন!"

"হ্যাঁ।"

"বড় সাহেব আপনাদের ডাকছেন!"

"কোন্ বড় সাহেব?"

"দোকানের। চলুন না—"

একটু অবাক হইয়া গেলাম।

নগেন বলিল, "চল না শোনাই যাক—কী বলে!"

চাপরাশি আমাদের একটি প্রশান্ত-বদন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। সাহেব দূরের একটি ঘরে বসিয়া আমাদের পোষাক-নির্বাচন-লীলা দেখিয়াছিলেন। আমরা যাইতেই বলিলেন, "আপনারা অতগুলো কস্ট্যুম দেখলেন, কিন্তু একটিও তো নিলেন না, পছন্দ হল না বুঝি?"

অপ্রস্তুত মুখে সত্য কথাটা বলিলাম।

"কত কম পড়ছে?"

"চোদ্দ আনা—"

সাহেব ঘণ্টা টিপিলেন। চাপরাশি পুনরায় প্রবেশ করিল।

"মিস জেসিকো সেলাম দেও!"

যে তরুণী আমাদের কস্ট্যুম দেখাইতেছিলেন, তিনি আসিলেন। তিনি প্রবেশ করিতেই সাহেব নিজের পকেট হইতে চৌদ্দ আনা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এঁদের যে পয়সাটা শর্ট পড়েছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওঁদের কস্ট্যুমটা দিয়ে ক্যাশমেমো দিয়ে দিন।"

তাহার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনারা খেলা-টেলা দেখতে নিশ্চয়ই এদিকে আসেন, তখন পয়সাটা আমাকে দিয়ে যাবেন।"

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সাঁতারু-জীবনের প্রবেশদ্বারে সেই হাস্যমুখ সাহেবটির ছবি আজও টাঙানো আছে। আরও দুইটি ছবিও আছে। সে দুইটির কথাও শুনুন। আমি ডাক্তারি পাশ করিতে পারি নাই, সাঁতারটা অবশ্য ভাল করিয়া শিখিয়াছিলাম। একটি সাঁতারু মেয়েকে বিবাহ করিয়া সাঁতারু-জীবনই যাপন করিতেছি।

সাঁতারের পোষাক সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি হইয়াছিল একটি মফঃস্বল শহরে। একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলাম। এমনি দুর্দৈব, আমার সুটকেসটি ট্রেনে চুরি গেল। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, কে নামাইয়া লইয়াছে। সুটকেসের ভিতর আমার সাঁতারের পোষাক ছিল। সুতরাং ট্রেন হইতে নামিয়াই সাঁতারের পোষাক কিনিবার জন্য বাজারে বাহির হইয়া পড়িতে হইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু হতাশ হইলাম। অধিকাংশ দোকানদার সুইমিং কস্ট্যুমের নাম পর্যন্ত শোনে নাই। অধিকাংশ দোকানেই ধুতি, শাড়ী, গামছা, ছিট্। একজন বলিল, "এখানকার সবচেয়ে বড় দোকান 'ভবতারণ ভাণ্ডার,' সেখানে গেলে পেতে পারেন।" ভবতারণ ভাণ্ডারেই গেলাম। সেখানে দেখিলাম বিরাট এক তাকিয়ায় হেলান দিয়া এক বিরাট পুরুষ গড়গড়া সহযোগে তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে তাঁহারই অনুরূপ ভীমকান্তি আর এক ভদ্রলোকের সহিত

রাজনীতি আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম, তাঁহারা বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মডারেট্‌রা ভাল, না একস্‌ট্রিমিষ্ট্‌রা ভাল, এই আলোচনাই করিতে লাগিলেন।

"সুইমিং কস্ট্যুম আছে কি ?"

"পাশের দোকানে যান, আমরা কাটা কাপড় বেচি, পাশেই ডাক্তার মিত্তিরের ডিস্‌পেনসারি, সেখানেই খোঁজ করুন।"

বুঝিলাম, তাঁহারা সুইমিং কস্ট্যুমের নাম পর্যন্ত শোনেন নাই, ভাবিয়াছেন আমি বুঝি কোন ঔষধ কিনিতে আসিয়াছি। তখনই আমার চলিয়া আসা উচিত ছিল, কিন্তু ললাট-লিপি খণ্ডন করা যায় না, তাই আমি বাংলা করিয়া বলিলাম, "ওষুধ নয়, আমি সাঁতারের পোষাক খুঁজছি।" বুঝাইয়া বলিলাম।

"ও, বুঝেছি। কাগজে টাইট্‌ গেঞ্জি-প্যাণ্ট-পরা ছোক্‌রা-ছুক্‌রিদের ছবি দেখি বটে মাঝে মাঝে। না মশাই, ওসব জিনিস আমার দোকানে পাবেন না !"

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আজ এখানে শীলেদের বাঁধে সাঁতার কম্পিটিশন হবে যে। কলকাতার বিখ্যাত সাঁতারু দুলালচাঁদ আসছেন—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি বটে। লোকটা নামী লোক—"

আর আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। নিজের পরিচয় দিলাম।

"ও, আপনিই দুলালচাঁদ, বসুন, বসুন—"

উভয়েই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

আমি উপবেশন করিলাম, এবং তাঁহাদের বুঝাইতে লাগিলাম সাঁতার কাটিতে হইলে সাঁতারের পোষাক কেন প্রয়োজন।

ভবতারণ ভাণ্ডারের মালিক সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "আপনি বিপদে পড়েছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু ও জিনিস তো আমার কাছে নেই। কারও কাছেই পাবেন না। আচ্ছা দাঁড়ান, গফুর, গফুর, ও গফুর !—"

পাশের ঘর হইতে পর্দা ঠেলিয়া লুঙ্গিপরা একটি শীর্ণ ব্যক্তি প্রবেশ করিল।

"এই বাবুর হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্টের মাপ নিয়ে নাও তো ! যান আপনি ওর সঙ্গে। চারটে নাগাদ সাঁতারের পোষাক পেয়ে যাবেন—"

"করিয়ে দেবেন বলছেন ?"

"হাঁ হাঁ মশাই, ভার নিলুম যখন করিয়ে দেব। খুব ভালো কাপড়ের করিয়ে দেব। কলকাতায় এমনটি পাবেন না—"

"কী কাপড়ের ?"

"সে দেখবেন তখন !"

ভদ্রলোকের চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া আর বেশী ইতস্তত করিতে সাহস হইল না। গফুর-দর্জির ঘরে গিয়া মাপ দিলাম। যাঁহার বাড়িতে উঠিয়াছিলাম, তিনিও আশ্বাস দিলেন, "ভবতারণবাবু স্বয়ং যখন ভার নিয়েছেন, তখন ঠিক পেয়ে যাবেন—"

সাড়ে পাঁচটার সময় সাঁতার আরম্ভ। ভবতারণবাবু ঠিক চারটের সময় যাইতে বলিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলাম দোকান বন্ধ, শুনিলাম ভবতারণবাবু এ-বেলা দোকান খুলিবেন না, সাঁতার দেখিতে যাইবেন। অনেক ডাকাডাকির পর গফুর-দর্জি পাশের একটি গলি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"ও, আপনি এসেছেন ! টেঁকে রেখেছি, এইবার কলটা চালিয়ে দিচ্ছি। এক্ষুনি হয়ে যাবে—"

বারান্দাতেই বসিয়া রহিলাম। সওয়া পাঁচটার সময় গফুর কোনক্রমে কাজ শেষ করিল। দেখিলাম কাপড়টা কালো এবং খুব খস্‌খসে গোছের।

গফুর বলিল, "ছাতার কাপড়। বাবু বললেন, জলে ভিজবে কিনা, ছাতার কাপড়েরই ভাল হবে।"

হাফ প্যাণ্টটা একটু আঁট এবং হাফ শার্টটা বেশ ঢিলা হইল। অদল-বদল করিবার আর সময় ছিল না। ওই কস্ট্যুম পরিয়াই প্রতিযোগিতায় নামিয়া গেলাম। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানই অধিকার করিয়াছিলাম, কিন্তু জল হইতে যখন উঠিলাম, তখন আমার সর্বাঙ্গ কালো হইয়া গিয়াছে। কাপড়ের রংটা কাঁচা ছিল।

একটা কথা কিন্তু না উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে। ভবতারণবাবু একটি পয়সাও দাম লন নাই। হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ওটা আপনাকে প্রেজেণ্ট করলাম। আপনি নামী লোক, গরিবের একটা স্মৃতিচিহ্ন থাক আপনার কাছে—"

সাঁতারের পোষাক সম্পর্কে একটি বিলাতী দোকানের এবং একটি স্বদেশী দোকানের গল্প বলিলাম। তৃতীয় গল্পটি আরও স্বদেশী। এক অজ পাড়াগাঁয়ে ভাগ্নের বিবাহ উপলক্ষে গিয়াছিলাম। সেখানে সকলে ধরিয়া বসিল, সাঁতার দেখাইতে হইবে। কয়েকজন উৎসাহী প্রতিযোগীও জুটিয়া গেল এবং স্পর্ধা করিতে লাগিল আমাকে হারাইয়া দিবে।

বলিলাম, "সঙ্গে তো সুইমিং কস্ট্যুম আনিনি। সুইমিং কস্ট্যুম না হলে সাঁতার কাটতে পারি না।"

ছোকরারা দমিয়া গেল। কিছুক্ষণ অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ একজন বলিল, "বেংকট বাবার কাছে গেলে কেমন হয়। তিনি ছবির অসুখের সময়ে থার্মোমিটার বার করে দিয়েছিলেন, আমাদের অসময়ে কাঁটাল খাইয়েছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে সুইমিং কস্ট্যুমও আনিয়ে দিতে পারবেন। চলুন না তাঁর কাছে। বেশী দূর নয়—"

"বেংকট বাবা কে ?—"

"মস্ত বড় সিদ্ধপুরুষ একজন। ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। সুখেনদাকে দামী একটা ঘড়ি আনিয়ে দিয়েছিলেন একবার।"

"কী করে আনিয়ে দিয়েছিলেন ?—"

"মন্তরের চোটে। আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে ঘড়িটা হাতে দিলেন। মনে হল যেন তাঁর কাছেই ছিল।"

কৌতূহল হইল। গেলাম বেংকট বাবার কাছে। ক্ষুদ্র খর্বকায় ব্যক্তি, চক্ষু দুইটি লাল। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "সাঁতার কাটবার জন্যে আবার পোষাকের দরকার কি! বাবা, সমস্ত ত্যাগ করে ভবসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে না পড়লে পার মিলবে না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ বাবা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ। পোষাক নিয়ে কী হবে!—"

বন্দেমাতরম্

শহরের গণ্যমান্য নাগরিক রায়বাহাদুর জগজ্জ্যোতি সিংহরায়ের কন্যা সুশীলা সহসা নিরুদ্দেশ হওয়াতে আমার কাজ আরও বাড়িয়া গেল। চোর, ডাকাত খুনী জালিয়াত্‌ ইহাদের লইয়াই আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই, বিবিধ প্রকার পাপী ও শয়তানদের পিছু পিছু ঘুরিয়া দিনকে রাত এবং রাতকে দিন করিয়া ফেলিতেছি—রায়বাহাদুরকে সবিনয়ে সে কথা নিবেদন করিলাম। তিনি কিন্তু না-ছোড়। অত বড় মানী লোক আমার কাছে হাতজোড় করিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,

"ওসব কোনও ওজর শুনব না ভাই। সি-আই-ডি হিসেবে তোমার যে সুনাম শুনেছি তার মর্যাদা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার মান সম্ভ্রম কলঙ্কে কালো হয়ে যাবে, আর তুমি বাঙালীর ছেলে হয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে সেটা!"

কি আর বলিব, কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া শেষে কথা দিয়া আসিলাম।

সুশীলার যে এই পরিণাম হইবে, তাহা পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম। মনোমত পাত্র পাওয়া যায় নাই বলিয়া রায়বাহাদুর তাহার বিবাহ দিতে পারেন নাই। যে ধরণের পাত্র সাধারণত আমাদের মনোমত হয় তাহা এদেশে দুর্লভ। অনেক টাকা খরচ করিয়াও মেলে না, এ যুক্তি কিন্তু বয়স বা যৌবনের উদ্দাম গতিকে রোধ করিতে পারে না। রায়বাহাদুর রোধ করিবার চেষ্টাও করেন নাই। বহুবিধ সৌখীন শাড়ী এবং অলঙ্কারে মেয়েকে সাজাইয়া ঐশ্বর্যের ময়ূরপংখীটিতে তাহাকে তুলিয়া দিয়াছিলেন। সংসার সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে সে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিল। কোনও সিনেমা, কোনও থিয়েটার, কোনও পার্টি সে বাদ দিত না। কলেজে কো-এডুকেশন তো ছিলই। ইহাই

আজকালকার হাওয়া এবং ইহাই না কি সভ্যতার মানদণ্ড। এ অবস্থায় যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছে, বিস্ময়ের কিছু নাই।

সুশীলার নাগাল কিন্তু সহজে পাইলাম না। দেখিতে দেখিতে প্রায় সাত আট মাস কাটিয়া গেল। রায়বাহাদুর পরিচিত মহলে প্রচার করিয়া দিলেন সুশীলা ব্যাঙ্গালোরে তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাছে গিয়াছে, সেখানে একজন খাঁটি মেমসাহেবের নিকট সে নাকি লেখাপড়ার সহিত বিলাতী সহবৎ শিক্ষা করিতেছে। তাহার পর বিলাত যাইবে। পরিচিত-মহল রায়বাহাদুরের সামনে দেঁতো হাসি হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। কিন্তু আড়ালে তাহারা যে হাসি হাসিল তাহা অন্য প্রকার। যাই হোক, এই ভাবেই চলিতে লাগিল। আমি যাবতপক্ষে রায়বাহাদুরের সহিত দেখা করিতাম না। দেখা হইয়া গেলে সত্য কথাই বলিতাম, যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। লোক লাগাইয়া চেষ্টা করিবার উপায় ছিল না, কারণ. রায়বাহাদুর ব্যাপারটা গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন।

এলাহাবাদে সিধু গুণ্ডার পিছু লইয়াছিলাম। সিধু গুণ্ডাই যে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা মাড়োয়ারিকে খুন করিয়া তাহার টাকার থলিটা ছিনাইয়া লইয়াছিল সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু লোকটা এমনই ধূর্ত্ত যে কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিতেছিলাম না। সে যে এই শহরেই আছে তাহারও প্রমাণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় যে আছে তাহা নির্ণয় করা যাইতেছিল না। সমস্ত হোটেলে এবং খাবারের দোকানে আমার গুপ্তচর ছিল। একজন আসিয়া খবর দিল যে শহরের বাহিরে যে ডাষ্টবিনটা আছে সেখানে নাকি গভীর রাত্রে সিধু খাবার লইবার জন্য আসে। একটা লোক সন্ধ্যার সময় সেই ডাষ্টবিনের ভিতর তাহার জন্য খাবার রাখিয়া যায়। কাছেই একটা গাছ ছিল, সন্ধ্যার পর তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরে সত্যই দেখিলাম একটা লোক তাহার ভিতর শালপাতা মুড়িয়া কি যেন রাখিয়া গেল। বুঝিলাম, একটু পরে সিধু আসিবে। সিধু অনেক রাত্রে আসিল এবং আসিল সাইকেল চড়িয়া। এটা আমি প্রত্যাশা করি নাই।

আমি গাছ হইতে নামিতে নামিতেই সে খাবার লইয়া অন্তর্দ্ধান করিল। আমার কিম্বা আমার সঙ্গের কনেষ্টবল দুইজনের সাইকেল ছিল না। আমরা পদব্রজেই সিধু যে পথে গিয়াছিল সেই পথেই চলিতে লাগিলাম। সাইকেলটা কিছুক্ষণ পরেই আঁধারে মিলাইয়া গেল। তবু আমরা চলিতে লাগিলাম। দুইদিকে ফাঁকা মাঠ, জনমানবের চিহ্ন নাই, গভীর অন্ধকার। ফিরিয়া আসিব কি না ভাবিতেছি এমন সময় কিছুদূরে একটা পোড়ো বাড়ি চোখে পড়িল। কাছে গিয়া দেখিলাম, খোলার বাড়ি, দুই দিকে মাটির দেওয়াল কোনক্রমে দাঁড়াইয়া আছে। টর্চের আলো ফেলিয়া ফেলিয়া কাছে গেলাম এবং ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সাধারণ দেশী কুকুর, লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম কুক্কুরী। তাহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সিধুকে দেখিতে পাইলাম না।

"কে আপনি ?"

টর্চের আলো ফেলিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শত ছিন্ন মলিন বসন, মাথার চুল রুক্ষ, একটি সদ্যোজাত শিশুকে বুকে চাপিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। ঠিক পাশেই দেখিলাম কতকগুলি কুকুর ছানাও রহিয়াছে। তাহাদের মা-ও পরমুহূর্ত্তে আসিল এবং তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাচ্চাগুলিকে ঘিরিয়া বসিল। সুশীলার চোখে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি, দেখিলাম সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

আমি একটি কথাও বলিলাম না। বলিতে পারিলাম না। জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

অঙ্কুর ও বৃক্ষ

ভদ্রলোক সত্যই বিপন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন। আমিও বেশ বিপন্ন হ'য়ে পড়লাম। কম টাকা নয়, প্রায় দু'হাজার টাকা। আমার কথায় অত টাকা সে কি ছেড়ে দিতে রাজি হবে? আমাকে অবশ্য সে খুবই খাতির করে। কিন্তু খাতির ক'রে বলেই কি অসঙ্গত অনুরোধ করা যায়। ভদ্রলোক কিন্তু না-ছোড়। হাত জোড় করে বলতে লাগলেন—"দয়া করুন ডাক্তার বাবু, বিশ্বাস করুন, তিন দিন না খেয়ে আছি।" চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল তাঁর। নিরুপায় হয়ে শেষে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে তাঁর উত্তমর্ণকে অনুরোধ করব যাতে তিনি সুদের টাকাটা ছেড়ে দেন। তাকে বুঝিয়ে বলব যে বসতবাটি বিক্রি করেও সব টাকা দিতে পারবেন না ভদ্রলোক। যতটা দিচ্ছেন ততটা নিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সিভিল জেল দিয়ে আর লাভ কি? ক্ষতিই বরং। আমার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ভদ্রলোক চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেলেন। অনাহার ক্লিষ্ট চেহারা। পরনে ছিন্ন মলিন বসন। দেখে সত্যিই দুঃখ হ'ল।

একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। অনেকদিন আগেকার ঘটনা, প্রায় বিশ বছরের। আমার এক বন্ধু হঠাৎ একদিন সকালে আমার বাসায় এসে উপস্থিত।

"অনেকদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই ভাবলাম নেবে পড়ি এখানে। পাটনায় যাচ্ছি একটা বিয়েতে। কাল বিয়ে, আজ রাত্রের ট্রেনে এখান থেকে রওনা হলেও ঠিক সময়ে পৌঁছান যায়। তারপর কেমন আছিস?—"

অনেকদিন পরে রতনকে দেখে খুব খুসী হলাম। রতনকে সত্যিই ভালবাসতাম, অন্য কোনও কারণে নয়, তার নিরহঙ্কার সরলতার জন্য।

লক্ষপতির একমাত্র ছেলে সে, লেখাপড়াতেও খুব ভাল, কিন্তু তার পোষাক-পরিচ্ছদে বা কথা-বার্ত্তায় কখনও কোন রকম চালিয়াতি লক্ষ্য করি নি। সদা-হাস্যময় আত্মভোলা লোক। অনেকদিন পরে দেখা হ'ল, দেখলাম একটুও বদলায় নি। তখন আমি সবে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছি, রোগীর ঝামেলা বিশেষ ছিল না, সমস্ত দিন খুব আড্ডা দেওয়া গেল তার সঙ্গে।

হঠাৎ রতন বলে উঠল—"ওহো, একটা জিনিস ভুল হয়ে গেছে! উর্দ্ধশ্বাসে ট্যাক্সি করে' এসে ট্রেন ধরেছি শাড়িখানা কিনে আনা হয় নি! এখানে ভালো কাপড়ের দোকান আছে?"

আমি ব্যাপারটা ধরতে পারি নি প্রথমে।

"কিসের শাড়ি?"

"বাঃ, বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি, শুধু হাতে কি যাওয়া যায়? একটা ভালো বেনারসী শাড়ি নিয়ে যাব ভেবেছি। এখানে দোকান আছে?"

"আছে। বেশ বড় বাঙালীর দোকান আছে একটা।"

"চল তাহলে সেখানে। একটা শাড়ি কিনে ফেলা যাক—"

আমার পরিচিত জগৎবাবুর জগজ্জ্যোতি ভাণ্ডারে রতনকে নিয়ে গেলাম। জগৎবাবু নিজের মৃতা পত্নী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর নামের প্রথমার্দ্ধের সঙ্গে নিজের নামের ব্যঞ্জন সন্ধি করে' দোকানটির নামকরণ করেছিলেন। দোকানটির তখন খুব চলতি।

আমরা যখন দোকানে গেলাম তখন বেলা আড়াইটে হবে। জগৎবাবু নিজেই দোকানে ছিলেন, কর্ম্মচারী কেউ ছিল না। তারা খেতে গিয়েছিল বোধ হয়। জগৎবাবু একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ঢুলছিলেন। আমরা দোকানে ঢুকতেই তাঁর কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল, মনে হ'ল একটু যেন অপ্রসন্ন হলেন। তাঁর ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূযুগল দেখে তাই-ই অনুমান করলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাই মুখে একটা ভদ্রতার হাসি টেনে আনলেন।

"ডাক্তার বাবু যে, আসুন! দুপুর রোদে বেরিয়েছেন যে!—"

"আমার এই বন্ধুটির কাপড় কেনার দরকার। বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে, একটা বেনারসী শাড়ি নিয়ে যেতে চায়। দিন একখানা—"

জগৎবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর দোকানের শেল্‌ফগুলোর দিকে চেয়ে বললেন—"শাড়ি? বেনারসী? আছে বোধ হয় নাগালের মধ্যে। দেখি—"

তাকিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। উঠতে গিয়ে কাছাটা খুলে গেল। সেটা গুঁজে কসিটা ঠিক করে' নিয়ে এগিয়ে গেলেন একটা শেল্‌ফের দিকে। সেখান থেকে একটা কাপড়ের বস্তা নামালেন ধপাস্‌ করে। তারপর তার পাশে উবু হ'য়ে বসে' বস্তাটি খুলে বার করলেন একখানি শাড়ি।

"নিন্‌ দেখুন—"

রতনের কিন্তু পছন্দ হল না।

"আর একটা দেখান—"

আর একটা দেখালেন তিনি। সেটাও কিন্তু রতনের পছন্দ হল না। তৃতীয় শাড়িখানাও যখন রতনের পছন্দ হ'ল না তখন জগৎবাবুর চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরেছে। গুম হ'য়ে নির্নিমেষে চেয়ে আছেন তিনি রতনের দিকে।

প্রশ্ন করলেন—"কি রকম শাড়ি চাই আপনার?—"

মিতভাষী রতন বললে—"ভালো শাড়ি। আছে কি আপনার?"

"আছে। আড়াই-শ' তিন-শ' টাকা দামের শাড়ি আছে—"

নির্বিকার কণ্ঠে রতন বললে—"বেশ, দেখান—"

"সত্যি সত্যি যদি নেন তাহলে দেখাই। তা না হলে শুধু শুধু সিঁড়িতে চড়ে' ওই ওপরের তাক থেকে নাবানোর কোন মানে হয় না!—নেবেন কি?"

"থাক আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।"

মৃদু হেসে উঠে পড়ল রতন, দোকান থেকে বেরিয়ে এল। আমাকেও বেরিয়ে আসতে হ'ল।

"কিনবি না?"

"অন্য দোকানে চল। এখানে কিনব না। অভদ্র লোক"

মনে পড়ল মথুরা দাসের কথা। মথুরা দাস আমার রোগী। ছোট একটি কাপড়ের দোকান করেছে সম্প্রতি। তার দোকানেই গেলাম। আমাদের দেখেই মথুরা দাস শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল এবং এমনভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করল যেন আমাদের পথ চেয়েই তার দিন কাটছিল।

"একখানা ভাল বেনারসী শাড়ি চাই শেঠজী, আমার দোস্তের জন্য—"

"আইয়ে বৈঠিয়ে—"

সাগ্রহে আহ্বান করল আমাদের, তারপর শাড়ি বার করতে লাগল। এক, দুই, তিন, চার—আর ছিল না বেচারীর দোকানে। রতনের একটাও পছন্দ হ'ল না। শেঠজী কিন্তু দমলেন না তাতে।

হিন্দি ভাষায় বললেন, "আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি আরও শাড়ি এনে দেখাচ্ছি। অন্য দোকান থেকে আনছি—"

দুপুরের রোদ তুচ্ছ করে' বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কিছুক্ষণ পরে ফিরল একগাদা শাড়ি নিয়ে, নানা দামের, নানা রঙের। একখানা শাড়ির জমি রতনের পছন্দ হ'ল, কিন্তু রংটা হ'ল না।

শেঠজী একটু অপ্রতিভ হ'য়ে প্রশ্ন করলেন, "বাবুজির কোন রং পছন্দ তাহলে ?—"

"ফিকে সবুজ—"

"হুজ্‌রিমলের দোকানটা এখন বন্ধ আছে। সেখানে ফিকে সবুজ রঙের কাপড় আছে। কাল এনে রাখব বাবু, কিম্বা বলেন তো ডাক্তারবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব—"

"বাবু তো কাল পর্য্যন্ত থাকবেন না। আজ সন্ধ্যার ট্রেনে পাটনা যাচ্ছেন—"

"ও, আচ্ছা দেখি—"

বেরিয়ে এলাম আমরা দোকান থেকে।

রতন বললে—"পাটনাতেই পেয়ে যাব বোধ হয় !"

সন্ধ্যার সময় রতনকে স্টেশনে তুলে দিতে যাবার জন্য বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় মথুরাদাস মারোয়াড়ি এসে হাজির। হাতে ফিকে সবুজ রঙের

তিনখানা শাড়ি। রতনের একখানা শাড়ি পছন্দ হ'ল। সাড়ে আট শ' টাকা দিয়ে কিনলে শাড়িখানা।

পরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম ওই শাড়িখানা বেচে একশ' টাকা লাভ করেছিল মথুরাদাস।

বিপন্ন ভদ্রলোকটিকে দেখে এই যে ঘটনাটা মনে পড়ল এটাকে অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করবেন না। রীতিমত প্রাসঙ্গিক। কারণ ঐ বিপন্ন ভদ্রলোকটিই একদা-ধনী জগৎ চৌধুরী। জগজ্জ্যোতি ভাণ্ডার ঋণের বন্যায় বহুকাল আগেই ভেসে গেছে। আর যার কাছ থেকে টাকা ধার করে' তিনি এই বিপুল বন্যায় নিজের নাকটি কোনক্রমে বার করে' রাখতে সক্ষম হয়েছেন তার নাম শেঠ মথুরাদাস,—যে একদিন রতনকে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি বেচেছিল আমার বাড়িতে এসে। তার এখন চারটে দোকান, দুটো মিল, ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকা।

আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন।

আমার অনুরোধে মথুরাদাস জগৎবাবুকে ঋণমুক্ত করে' দিয়েছিল।

অগ্রগামী

পুরাতন বন্ধু উমানাথ বাজপেয়ী কর্ম হইতে অবসর লইয়া কাশীবাস করিতে যাইতেছিল। দিল্লী এক্সপ্রেস ভাগলপুর পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেল। সামনের স্টেশনে একটি গাড়ি লাইনচ্যুত হইয়া পথ আটকাইয়াছিল। উমানাথ জানিত আমি ভাগলপুরে আছি। গাড়ী ছাড়িবার প্রচুর দেরী আছে দেখিয়া সে পুরাতন বন্ধুত্বটা ঝালাইয়া লইবার মতলবে নিজের জিনিষপত্র নামাইয়া একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে আরোহণ করিল এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়া ফেলিল। পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বলিলাম,—

"আজ আর তোমার যাওয়া হচ্ছে না। এসেছ যখন থেকেই যাও দু'একদিন—"

"আজকের দিনটা তো থাকতেই হবে মনে হচ্ছে, কাল যদি গাড়ি চলে তখন দেখা যাবে—"

সন্ধ্যার পর ছাতের উপর ক্যাম্প-চেয়ার বিছাইয়া উভয়ে বিশ্রম্ভালাপে রত হইলাম। পূর্বজীবনের নানা কথার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"তুমি তো এস, পি, হয়েই রিটায়ার করলে—"

"হ্যাঁ। ডি, আই, জি, হওয়া আর হল না।"

"চাকরি জীবনটা কেমন লাগল?"

"রট্‌ন্! নরক বাস!..."

"পয়সা-কড়ি কেমন রোজগার হল?"

"তা মন্দ হয়নি। গোটা দুই ছেলে আছে, তাদের উচ্ছন্ন যাবার পাথেয় রেখে যাব।"

"কেন, লেখাপড়া শেখেনি তারা?"

"ম্যাট্রিকের বেড়া পার হতে পারেনি।"

"আর ছেলে-পিলে নেই তোমার ?"

"তিনটি মেয়ে আছে। তিনটেই বিধবা, তার মধ্যে একটি পাগল।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। বাজপেয়ী-ই হঠাৎ আবার বলিল,—

"বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে যাচ্ছি। ভরসা আছে তিনি ঠেলে ফেলে দেবেন না, দু'চারটে ভাল কাজ করেছি জীবনে।" বলিলাম,—

"তোমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই খুব বিচিত্র। কোন সাহিত্যিক জানতে পারলে হয়তো আমাদের সাহিত্যেও শার্লক হোমস্, পইরো বা ফাদার ব্রাউন দেখা যেত—"

"ভবিষ্যতে কি হবে জানি না, কিন্তু আমার যে-ধরণের অভিজ্ঞতা তা' অত্যন্ত সাদা-মাটা, চাঁছা-ছোলা, পরিষ্কার ব্যাপার। কোনও বুদ্ধিমান ডিটেক্‌টিভের দরকার হয় না তার জন্যে। ডিটেক্‌টিভ দরকার হতে পারে কে কি ভাবে ঘুস খাচ্ছে তাই ধরবার জন্যে, চোর ডাকাত খুনী ধরবার জন্যে নয়। আমাদের দেশের ডিটেক্‌টিভরা, ইংরেজ আমলে অন্তত, দেশের সচ্চরিত্র ভদ্রলোকেদেরই ফাঁসাবার চেষ্টা করত খালি। টেররিস্ট মুভ্‌মেন্টের কথা ভেবে দেখ। আমি নিজের স্বপক্ষে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, বিপ্লবী দু'একটি ছেলেকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছি। সেইজন্যেই হয় তো বিশ্বেশ্বর আমাকে দয়া করতে পারেন—"

"বল না শুনি দু'একটা ঘটনা !"

ঠিক এই সময়ে ভিতর হইতে গৃহিণীর আহ্বান আসিল—

"খাবার দেওয়া হয়েছে, তোমরা খাবে এস !"

গল্পটা চাপা পড়িয়া গেল। সকালেই আমার কাজের ভীড়। গল্প শুনিবার অবসর নাই। বলিলাম,—

"তোমার গল্পটা আর শোনা হল না। আজ থেকে যাও—"

"না ভাই, জিনিষপত্র সব পেঁাছে গেছে, ষ্টেশনেই পড়ে আছে হয়ত। গল্পটা লিখে পাঠিয়ে দেব, তবে যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছিলাম তাতে আমার

ক্বতিত্ব কিছুই নেই। তবে গল্পটা তোমার মন্দ লাগবে না বোধ হয়। বীভৎস গল্প, তবে তার অন্তরালে কিছু পাবে হয়তো।"

বাজপেয়ী সেইদিনই চলিয়া গেল। দিন দশ-বারো পরে সত্যই সে নিম্নলিখিত গল্পটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল।

আমি যখন শেরপুরায় বদলি হইয়া আসিলাম তখন আমাকে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। একেবারে নূতন জায়গা, পরিচিত লোক তেমন কেহ নাই যে কাজকর্মের পর দুই দণ্ড গল্প করিয়া কাটাই। তখনও আমি বিবাহ করি নাই, মন্ত্রও লই নাই। অবসর পাইলে তাস খেলিতাম। কিন্তু শেরপুরায় তখন কোনও ক্লাব ছিল না। সাধারণত দারোগার সঙ্গীর অভাব হয় না, অনেকে বরং দারোগার সহিত ভাবই করিতে চায়। কিন্তু ইহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে-জাতীয় লোক হয় তাহাদের সহিত অবসর-বিনোদন করিবার মতো প্রবৃত্তি আমার তখন ছিল না। আমি যথাসম্ভব ন্যায়-নিষ্ঠ ভাবেই কাজ করিবার চেষ্টা করিতাম এবং পারতপক্ষে এমন কোনও লোকের সহিত মিশিতাম না, যাহারা আমার নিষ্ঠাকে বিচলিত করিতে পারে। সুতরাং শেরপুরায় প্রথম কিছুদিন নিঃসঙ্গ জীবনই যাপন করিতে হইয়াছিল। হঠাৎ একদিন বিধাতা কৃপা করিলেন, বাল্যবন্ধু সুরনাথের সহিত বহুকাল পরে হঠাৎ পথে দেখা হইয়া গেল। সুরনাথ শুধু আমার বাল্যবন্ধুই নয়, আমার দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতিও। বলা বাহুল্য হাতে স্বর্গ পাইলাম। শুনিলাম সুরনাথ শেরপুরা হইতে ক্রোশ দুই দূরে সস্তায় কিছু জমি কিনিয়াছে এবং সেই জমিতেই বসবাস করিতেছে। আমাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রতিশ্রুতি দিলাম: যাইব এবং সেইদিনই গেলাম। আমার ঘোড়া ছিল, বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না। বৈকালে গিয়াছিলাম, তখনও দিনের আলো ছিল। দেখিলাম সুরনাথ যে-স্থানে বসবাস করিয়াছে সে-স্থানটি লোকালয়ের একেবারে বাহিরে। একটু বিস্মিত হইলাম। বীরভূম জেলায় তাহার বাড়ি ছিল, কিছু জমিদারীও ছিল, সে এরকম নির্বান্ধব পুরীতে আসিয়া বসবাস করিতে গেল কেন? জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"মীনুও এখানে আছে তো?"

মীনু আমার দূরসম্পর্কীয়া সেই ভগ্নীর নাম।

"না, সে ভাই অনেকদিন আগে মারা গেছে। সেই জন্মেই তো দেশে আর ভাল লাগল না। এখানে পালিয়ে এসেছি—"

"দেশের বিষয়-সম্পত্তি?"

"সব বিক্রি ক'রে দিয়ে এখানেই বিঘে পঞ্চাশেক জমি কিনেছি—"

"ছেলে-পিলে হয়নি?"

"না—"

"একেবারে একা থাক এখানে?"

"ঠিক একা নয়। ওই যে দূরে একটা বাড়ি দেখছ ওখানে আমার এক বন্ধু থাকে। সে-ও আমার সঙ্গেই জমি কিনেছিল। দু'জনে একসঙ্গে চাষবাস করি, বেশ আছি। ওরে ভজুয়া, চা নিয়ে আয়! চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে না কি?"

"না—"

"আর বিয়ে করনি?"

"না। ওসবে আর রুচি নেই।"

ভজুয়া একটু পরে চা লইয়া আসিল। ভজুয়াকে দেখিয়া অস্বস্তি বোধ করিলাম। কুচকুচে কালো রং, খুব লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কিছু গোঁফ-দাড়িও আছে, কিন্তু সুবিন্যস্ত নয়, খাপ্‌চা-খাপ্‌চা। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, কিন্তু ভয়ঙ্কর। মনে হয় শ্বাপদের চক্ষু। ভজুয়া চা দিয়া চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"এ চাকর কোথায় পেলে? এখানকারই লোক?"

"না, বাইরের। মাসখানেক হ'ল এসেছে। কেন?"

"অতি বদ চেহারা।"

"তা বটে। মাইনে নেয় না, পেট-ভাতাতেই কাজ করে, তাই রেখেছি। চেহারা খারাপ বটে কিন্তু খুব কাজের, জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজ করতে পারে। চেহারাটা অবশ্য খুবই খারাপ।"

ভজুয়া-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। সুরনাথের বন্ধু কালিপ্রসাদ দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিলেন। লোকটি একচক্ষু। আলাপ করিয়া মনে হইল বেশ আমোদপ্রিয়। প্রকাশ পাইল তিনিও অবিবাহিত। আমারও তখন বিবাহ হয় নাই। হাসিয়া বলিলাম,—

"চতুর্থ আর একজন অবিবাহিত লোক জুটলে আমরা ব্যাচিলার্স কার্ড-ক্লাব করতে পারতাম—"

কালিপ্রসাদ বলিলেন,—

"আছেন একজন। আমাদের সঙ্গে তেমন আলাপ হয় নি এখনও। মাস দুই আগে তিনিও এখানে জমি কিনবেন ব'লে এসেছেন। সুরনাথ, মিস্টার বক্শীকে খবর পাঠাও না একটা, দারোগাবাবুর নাম শুনলে হয়তো চ'লে আসবেন! আমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপটাও হয়ে যাবে, কার্ড-ক্লাবটারও গোড়া-পত্তন হবে—"

"বেশ, ভজুয়াকে পাঠাচ্ছি।"

একটা চিঠি লইয়া ভজুয়া সাইকেল চড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা গল্প করিতে লাগিলাম। গল্প কিন্তু জমিল না। কালিপ্রসাদবাবুর অদ্ভুত এক-চক্ষুটি গল্পের রসভঙ্গ করিতে লাগিল। শেষে না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিলাম না।

"আপনার চোখটি গেল কি করে?"

"এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলাম।"

"বাঘিনী? শিকার করার শখ আছে নাকি?"

"ছিল এককালে।"

কালিপ্রসাদবাবুর চোখে অদ্ভুত একটা ভাব ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম সুরনাথও তাহার দিকে চাহিয়া একটা অদ্ভুত হাসি হাসিতেছে। আমি বলিলাম,—

"তাহলে তো আপনি গুণী লোক মশায়। বলুন, বলুন শুনি আপনার শিকার-কাহিনী—"

কালিপ্রসাদবাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন—

"সে অনেক লম্বা কাহিনী, আর একদিন শুনবেন। আজ আমার একটু কাজ আছে—"

কালিপ্রসাদবাবু উঠিয়া পড়িলেন। আমার মনে হইল গল্পের সুরটা যেন কাটিয়া গেল। কালিপ্রসাদবাবু চলিয়া যাইবার পর আর একটা ব্যাপারে একটু বিস্মিত হইলাম। বাড়ির ভিতরের দিক হইতে নারীকণ্ঠের একটা কলহাস্য ভাসিয়া আসিল। সুরনাথ সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে চাহিল অর্থাৎ বুঝিবার চেষ্টা করিল হাসিটা আমি শুনিয়াছি কি না, শুনিয়া থাকিলে কি ভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"বাড়িতে কোনও মেয়েছেলে আছে না কি ?—"

"তা আছে বই কি। চাকরানী আছে, চাকরদের বউ আছে। কেন তুমি অন্য কিছু ভাবছ না কি ?"

"না, না।—"

সুরনাথের চোখে-মুখে কেমন একটা হিংস্রভাব যেন ক্ষণিকের জন্য মূর্ত্ত হইয়া মিলাইয়া গেল। সুরনাথ আমার বাল্যবন্ধু, তাহার সহিত আত্মীয়তাও আছে, কিন্তু সহসা অনুভব করিলাম তাহাকে আমি চিনি না। যাহাকে আমি চিনিতাম, সে অন্য লোক।

ভজুয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল বক্‌শীবাবুর মাথা ধরিয়াছে বলিয়া আসিতে পারিলেন না।

আমিও উঠিয়া পড়িলাম। আমার ঘোড়া ছিল। ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছি এমন সময় ভজুয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—

"হুজুর, আমি লণ্ঠন আর লাঠি নিয়ে আপনাকে মাঠটুকু পার ক'রে দিয়ে আসি—"

"কেন ?—"

"এ-মাঠে বড় বড় গোখরো সাপ আছে হুজুর। সেদিন একটা ঘোড়াকেই কামড়েছিল।"

সুরনাথও সে-কথার সমর্থন করিল। বলিলাম,—

"তবে চল—"

আমি অশ্ব-পৃষ্ঠে উঠিলাম। ভজুয়া লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া আমার আগে আগে চলিতে লাগিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

"তোমার দেশ কোথা?"

"আজ্ঞে মানভূম হুজুর। পুরুলে থেকে কোশ পাঁচেক হবে।"

"দেশ ছেড়ে এখানে এলে কেন?"

"কলেরায় সব মরে গেল যে হুজুর। তাই যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে এলাম—"

ভজুয়াকে বেশী দূর যাইতে হইল না। কারণ আমার হাবিলদার সাহেব সাইকেলে চড়িয়া আমার খোঁজে আসিতেছিলেন। থানায় একটা দাঙ্গার সংবাদ আসিয়াছিল। হাবিলদার সাহেব দেখিলাম ভজুয়াকে চেনেন। বলিলেন,

"কে ভজু না কি। আজ শহরে যাও নি?—"

"না।"

ভজুয়া চলিয়া গেলে হাবিলদার সাহেব বলিলেন, ভজু প্রত্যহ গাঁজা কিনিবার জন্য আবগারির দোকানে যায়। বলিয়া একটু হাসিলেন।

"তাই নাকি! আপনি জানলেন কি ক'রে?"

"আমিও ভাং কিনিতে যাই যে। রোজই দেখা হয়।"

"ও—"

হাবিলদার সাহেব আর একটা কথাও বলিলেন।

"ভজু খুব গুণী লোক হুজুর। অনেক রকম গাছ-গাছড়া চেনে, অনেক ভাল ওষুধও দিতে পারে। শুনলাম সুরনাথবাবু ওঁকে নিজের চিকিৎসার জন্যেই রেখেছেন।"

"সুরনাথবাবুর অসুখ আছে না কি কোনও? দেখে তো কিছু মনে হলনা।"

হাবিলদার সাহেব কয়েক সেকেণ্ড চুপ করিয়া থাকিয়া একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন,—

"শুনেছি পুরোনো গণোরিয়া। এখানকার অনেক ডাক্তার কবিরাজ হাকিম ওঁর চিকিৎসা করেছেন, কিছু হয়নি। এখন ভজু ওকে ওষুধ দিচ্ছে—"

আমি এ-সব খবর শুনিয়া শুধু বিস্মিত নয়, একটু বিচলিতও হইলাম।

"আপনি এত-সব খবর জানলেন কি ক'রে ?"

"আমি তো এখানে অনেকদিন আছি হুজুর। অনেকের অনেক খবর জানি। সুরনাথবাবুর সব্জি বাগানের মালীই আমাকে বলেছিল একদিন। সুরনাথবাবু আপনার কেউ হয় না কি—"

এ-সব খবর শোনার পর তাহার সহিত আত্মীয়তা আছে এ-কথা আর বলিতে পারিলাম না। বলিলাম,—

"ছেলেবেলায় এক সঙ্গে এক স্কুলে পড়তাম, সেদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তাই এসেছিলাম—"

হাবিলদার বলিলেন,—

"ওর ভারী বদনাম এখানে। ওঁর কানা দোস্তটিও ভাল নয়।"

উপরোক্ত ঘটনার পর আমি আর সুরনাথের কাছে যাই নাই. যাইবার উৎসাহ পাই নাই। একদিন কিন্তু যাইতে হইল। গভীর রাত্রে সুরনাথের একটি চাকর ভজুয়া নয়, অন্য চাকর, আসিয়া আমাকে যে-সংবাদটি দিল তাহা ভয়ানক। বলিল, সুরনাথকে এক প্রকাণ্ড গোক্ষুর দংশন করিয়াছে। সুরনাথ অবিলম্বে আমাকে একজন ডাক্তার লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—

"সাপে কামড়েছে ? সাপটাকে দেখেছিস ?"

"সবাই দেখেছে হুজুর, প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ ! বাবুর ঠোঁট মুখ সব নীল হয়ে গেছে। অতি কষ্টে কথা বলতে পারছেন, অতি কষ্টে আপনার কথা বললেন—"

ডাক্তার মৈত্রকে লইয়া যতশীঘ্র সম্ভব অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখিলাম সুরনাথ মারা গিয়াছে। তাহার মুখটা নীল, মনে হইতেছে কেহ যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে। পায়ের গোছে দুই তিন স্থানে দড়ি বাঁধা রহিয়াছে, শুনিলাম পায়ের পাতায় সাপটা কামড়াইয়াছিল। ক্ষতস্থানের উপর ভজুয়া কি একটা জংলি-গাছের পাতা বাটিয়া লাগাইয়া দিয়াছে। ডাক্তার মৈত্র পাতা-বাটাটা জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ক্ষত-চিহ্নটি দেখিলেন। দুইটি

কালো কালো বিন্দু পাশাপাশি দেখা গেল। দুইটি বিন্দুর মধ্যে প্রায় আধ ইঞ্চি ব্যবধান! ডাক্তার মৈত্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া টর্চ ফেলিয়া বিন্দু দুইটিকে বারবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন,—

"খুব বড় সাপ মনে হচ্ছে। সাপটা কত বড় ছিল— ?"

"প্রকাণ্ড সাপ হুজুর। পাঁচ ছ'হাত হবে—"

ভজুয়া বলিল, "আরও বড়।"

আমি ডাক্তার মৈত্রকে প্রশ্ন করিলাম—

"বড় সাপ বুঝলেন কি ক'রে ?"

"দুটো দাঁতের মাঝখানে কত বড় ফাঁক দেখছেন না ? আমি এত বড় ফাঁক আগে দেখিনি।"

ভজুয়া বলিল, "অত বড় সাপও, আজ্ঞা, আমরা দেখিনি কখনও। কি বল যদু ?"

যদু নামক মালীটি সে-কথা স্বীকার করিল। আরও অনেকে সাপটি দেখিয়াছিল। সকলেই সমস্বরে বলিল সাপটি সত্যই প্রকাণ্ড বড়। ঘরের মধ্যে এবং বারান্দায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন লোক সমবেত হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"এতগুলো লোক সবই কি সুরনাথের চাকর ?"

কে একজন উত্তর দিল,—

"কালিপ্রসাদবাবুর চাকরদেরও ভজুয়া ডেকে এনেছে।"

"কালিপ্রসাদবাবু কোথা ?"

"তিনি আসেন নি তো দেখছি! ঘুমুচ্ছেন বোধ হয়।"

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক বোধ হইল।

"ভজুয়া, কালিপ্রসাদবাবুকে খবর দেয়নি ? ভজুয়া কোথা গেল ?—"

ভজুয়ার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ভীড়ের ভিতর হইতে একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল,—

"বাবুকে কি ডেকে আনব ?"

"তুমি কে ?"

"আমি তাঁর চাকর। তিনি ন'টার পর ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েন। ঘুম এসে গেলে ভজুয়া তাঁর ঘুম ভাঙাতে মানা ক'রে দিয়েছে, তাই তাঁকে আমরা কেউ ওঠাই নি—"

"ভজুয়া মানা করেছে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এঁরা দু'জনই তো ভজুয়ার তৈরি কি ওষুধ রোজ খান। আমি ডেকে আনছি তাঁকে—"

লোকটি চলিয়া গেল। আমি যদু নামক মালীটির নিকট হইতে সন্ধ্যা হইতে কি কি ঘটিয়াছিল, কে কে আসিয়াছিল খবর লইতেছিলাম এমন সময় সেই লোকটি, যে, কালিপ্রসাদবাবুকে ডাকিতে গিয়াছিল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে কালিপ্রসাদবাবুকে কে খুন করিয়া গিয়াছে।

আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া যাহা দেখিলাম তাহা ভয়াবহ। দেখিলাম—কালিপ্রসাদবাবুর দ্বিতীয় চক্ষুটি কে উপড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। সমস্ত বালিশ রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। আর একটা চমকপ্রদ ঘটনাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল। কালিপ্রসাদবাবুর ঘরের পাশেই আর একটা ছোট ঘর ছিল। সেই ঘরের ভিতর হইতে একটা খড় খড শব্দ শোনা গেল। দুই ঘরের ভিতর ছোট একটা বন্ধ কপাট ছিল। কপাটটা খুলিতে তাহার ভিতর হইতে প্রকাণ্ড একটা নেউল বাহির হইয়া আসিল এবং নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। সকলেই দেখিতে পাইল নেউলটার পায়ে এবং মুখে রক্ত মাখা। সে যেদিক দিয়া চলিয়া গেল লণ্ঠন লইয়া দেখিলাম রক্তাক্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণের জন্য আমরা সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। বলিলাম—

"ভজুয়াকে ডাক!"

ভজুয়ার কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাহাকে আর পাওয়া গেল না। একজন বলিল,—

"সে হয়তো বক্‌শীবাবুকে খবর দিতে গেছে—"

"দেখ তো!—"

আমি এবং ডাক্তারবাবু বাড়িটির চারিদিক লণ্ঠন এবং টর্চ লইয়া যতটা

পারিলাম দেখিলাম। অন্ধকারে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। যে লোকটি বক্‌শীবাবুর বাড়ি গিয়াছিল সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল বক্‌শীবাবুর বাড়ীতে ভজুয়া তো নাই-ই, বক্‌শীবাবু-ও নাই।

তখন ডাক্তারবাবুকে বলিলাম,—

"ব্যাপার ক্রমশ ঘোরতর হয়ে আসছে ডাক্তার মৈত্র। আমি তো সঙ্গে কোনও পুলিশ আনি নি। আপনি বাইক ক'রে থানায় চলে যান, হাবিলদার সাহেবকে জনকয়েক কনেষ্টবল নিয়ে এখুনি চ'লে আসতে বলুন! তারা যেন বন্দুকও আনে।"

ডাক্তার মৈত্র বলিলেন,—

"আমি যাচ্ছি, লাস ছু'টোকে পোষ্টমর্টেম করতে হবে। আমার বিশ্বাস এর ভিতর অনেক রহস্য আছে।"

...পুলিশ এবং বন্দুকের নাম শুনিয়া অনেকেই সরিয়া পড়িল। আমি, সুরনাথের মালী যদু এবং আরও গোটা দুই লোক হাবিলদার সাহেবের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। এ-রকম অভিজ্ঞতা আমার আর কখনও হয় নাই। ফাঁকা মাঠের মাঝে অসংখ্য ঝিল্লী ডাকিতেছে, আকাশে নক্ষত্রের ঝাঁক, কাছে দূরে বড় বড় গাছ। বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম কে ইহাদের খুন করিল এবং কেন করিল। সুরনাথের মৃত্যু যে সর্পাঘাতে হয় নাই এবং কালিপ্রসাদের চক্ষুও যে নেউলে উপড়াইয়া লয় নাই এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সাপটাকে অনেকে দেখিয়াছে, নেউলটাকেও আমরা দেখিলাম, নেউলটার মুখে এবং পায়ে রক্তও ছিল। ডাক্তার মৈত্র বলিতেছেন সুরনাথের পায়ের ক্ষত-চিহ্নটি সন্দেহজনক, ক্ষত-বিন্দু দুইটির মধ্যে ফাঁক অনেক বেশী, কিন্তু সাপ যদি একান্ত হয় তাহা হইলে...আমার চিন্তা-ধারা সহসা ব্যাহত হইল। একটা নারীকণ্ঠের কলহাস্যে চমকাইয়া উঠিলাম। মনে পড়িল প্রথম দিনও ওই হাসি শুনিয়াছিলাম। যদুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"হাসছে কে?"

"ছুক্‌রি বোধ হয়।"

"ছুক্‌রি কে ?"

যদু একটু চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর উত্তর দিল—

"ওকে বাবু কিছুদিন আগে রেখেছিল।"

"কোথা সে ?"

"ভিতরে আছে বোধ হয়।"

"ডেকে নিয়ে এস তো !"

যদু ভিতরে চলিয়া গেল, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—

"কই ভিতরে দেখছি না, বাইরে কোথাও আছে বোধ হয় !"

"ডাক তাকে।"

"বাইরে বড় অন্ধকার বাবু ! আমার ভয় করছে বেরুতে।"

যদুর দোষ ছিল না, আমার নিজেরই গা ছমছম করিতেছিল। যে লণ্ঠনটা জ্বলিতেছিল সেটারও শিখা ক্রমশ ম্লান হইয়া আসিতেছিল। নাড়িয়া দেখিলাম তেল নাই। শঙ্কিত হইয়া পড়িলাম।

"আর তেল আছে ?"

"তেল আর নেই। তবে পেট্রোম্যাক্‌স আছে একটা। তাতে তেল থাকতে পারে। পিছন দিকের ঘরে আছে পেট্রোম্যাক্‌সটা—"

"পেট্রোম্যাক্‌সটাই জ্বাল। স্পিরিট আছে তো ?"

"দেখি—"

যদু লণ্ঠনটা লইয়া ভিতরে গেল এবং একটু পরেই আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—'সাপ, সাপ—'

ছুটিয়া গেলাম, দেখিলাম পিছনের ঘরে সত্যই একটা বিরাট গোক্ষুর ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যদু বলিল—

"সাপটা ওই ঝুড়ির মধ্যে ছিল। এ-রকম ঝুড়ি এখানে আগে দেখি নি। তাই মনে হল এটা কোথা থেকে এল। যেই তুলে দেখতে গেছি—আর অমনি বাপরে বাপ ! উঃ খুব বেঁচে গেছি—"

যদু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। আমি দেখিলাম ঝুড়িটা সাপুড়েদের ঝুড়ি। সাপটা ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমার কাছে লোডেড্

রিভলভারটা ছিল, সাপটা পলাইতে পারিল না। এক গুলিতেই ভূশায়ী হইল। গুলিটা মাথায় লাগে নাই, ঘাড়ের কাছে লাগিয়াছিল। আবার সেই হাসিটা শুনিতে পাইলাম। এবার অনেক দূরে। কি যে করিব মাথায় আসিল না। হাবিলদার সাহেব ও কনেষ্টবলরা না আসা পর্য্যন্ত কিছুই করিবার উপায় ছিল না। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে তাহারা আসিল। তাহারা আসিবার পর চারিদিকটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। কিন্তু ভজুয়া বা ছুকৃরির সন্ধান পাইলাম না। বকশীবাবুও অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন।

পাঁচ ছয়জন পুলিশকে পাহারায় রাখিয়া আমি অবশেষে ফিরিয়া গেলাম। পরদিন বোঝা গেল পুলিশরা অবশ্য জাগিয়া পাহারা দেয় নাই, কারণ সকালে পোস্টমর্টেম (শব-ব্যবচ্ছেদ) করিবার জন্য ডোমেরা যখন লাস লইতে আসিল, তখন দেখা গেল, সুরনাথেরও চক্ষু দুইটি নাই, কেবল দুইটি রক্তাক্ত গহ্বর রহিয়াছে। শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উভয়েরই পেট হইতে প্রচুর আফিং পাওয়া গেল। সিভিল সার্জন বলিলেন আফিংই উভয়ের মৃত্যুর কারণ। সাপটার শবও ব্যবচ্ছেদিত হইয়াছিল, এটা অবশ্য ডাক্তার মৈত্র আলাদা করিয়াছিলেন। দেখা গেল সাপটার বিষ দাঁত নাই, দুই একদিন পূর্বেই তাহা তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল না যে বকশীবাবু, ভজুয়া এবং ছুকৃরিই এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট। কয়েকটা পায়ের এবং হাতের ছাপ সংগ্রহ করিয়া আমরা 'হুলিয়া' করিয়া দিলাম, পুরস্কারও ঘোষণা করিলাম, কিন্তু তাহাদের আর নাগাল পাইলাম না। কেন যে তাহারা উভয়কে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই কারণ সুরনাথ এবং কালিপ্রসাদের একটি জিনিসও চুরি যায় নাই।

বুঝিতে পারিলাম মাসখানেক পরে। একটি পত্র আসিয়া রহস্যোদ্ঘাটন করিল। পত্রটি এই—

দারোগাবাবু,

ইতিপূর্বে বহুবার আপনাদের ফাঁকি দিয়াছি এবারও দিলাম। এ পত্র আপনাদের লিখিতাম না, কিন্তু পাছে আপনারা কতকগুলি

নির্দোষ লোককে ধরিয়া সাজা দেন, তাই সত্য ঘটনাটা প্রকাশ করিতেছি। যাহাদের আমরা খুন করিয়াছি তাহারা উভয়েই চরিত্রহীন দুর্বৃত্ত ছিল। অকথ্য অসংযমের ফলে উভয়েরই সিফিলিস. গণোরিয়া তো হইয়াছিলই, উভয়ে অসমর্থও হইয়া পড়িয়াছিল। দৈহিক অপটুতা কিন্তু তাহাদের মানসিক কামনাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। স্ত্রী-সম্ভোগ করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না, কিন্তু বাসনা লোপ পায় নাই। এ নষ্ট ক্ষমতা ফিরিয়া পাইবার জন্য বহুপ্রকার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে তাহারা এক ভয়াবহ কাণ্ড করিয়া বসিল। জানি না কাহার নিকট হইতে তাহারা শুনিয়াছিল যে, কোনও জীবন্ত কুমারীর চক্ষু উপড়াইয়া যদি তাহা কাঁচা গিলিয়া খাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের যৌবন ফিরিয়া আসিবে। এই বিশ্বাসে একদিন রাস্তা হইতে একটি ছোট মেয়েকে তাহারা ভুলাইয়া লইয়া যায়। মেয়েটি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু বিধাতার এমনই চক্র যখন তাহারা একটি নির্জন প'ড়ো বাড়ীতে মেয়েটির চক্ষু উৎপাটন করিতেছিল তখন মেয়েটির মাসী সেখানে আসিয়া পড়ে। মেয়েটির মাসী চুড়ি ফেরি করিত। চুড়ি ফেরি করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ওই পোড়ো বাড়ীর ভিতরের দিকের বারান্দায় একটু হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে আসিত। সেদিন আসিয়া সে দেখিল ভিতরের দিকে একটা ঘরে বসিয়া দুইটা লোক মদ খাইতেছে, তাহাদের হাতে, কাপড়ে রক্তের দাগ। তখনও সে বুঝিতে পারে নাই যে তাহার বোনের মেয়েকেই তাহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। সে নিঃশব্দে ঢুকিয়াছিল এবং উঠানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাহাদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছিল। হঠাৎ লোক দুইটা তাহাকে দেখিতে পাইল এবং জানলা টপকাইয়া পলায়ন করিল। তখন মেয়েটি কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহা মর্মান্তিক। তাহার বোনঝি মুনিয়ার রক্তাক্ত চক্ষুহীন মৃতদেহটা পাশের ঘরেই পড়িয়াছিল। সে চীৎকার করিল না। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সে ভাবিল চীৎকার করিয়া লোক জড় করিলে সে নিজেই হয়তো খুনের দায়ে জড়াইয়া পড়িবে। সে পুলিশেও গেল না। আমার

সহিত তাহার এবং তাহার বোনের যোগাযোগ আছে পুলিশের এ সন্দেহ ছিল, তাই তাহারা পুলিশকে এড়াইয়া চলিত। সে সোজা আমার নিকটে আসিয়া সমস্ত ঘটনা বলিল। আমার সহিত তাহাদের সম্পর্কের কথাটা খুলিয়া না বলিলে আপনার মনে হয়তো নানারূপ সন্দেহ হইতে পারে, তাই কথাটা খুলিয়াই বলিতেছি। আমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবী দলের একজন। যে সব পুলিশ অফিসার আমাদের জ্বালাতন করিত, কিম্বা আমাদের দলের যেসব লোক অ্যাপ্রুভার হইয়া আমাদের ধরাইয়া দিত তাহাদের হত্যা করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। প্রফুল্ল চাকীকে যে সাব-ইনস্পেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জি পুলিশে ধরাইয়া দেয় সেই নন্দলাল ব্যানার্জিকে আমিই হত্যা করি। এ সব কাজ করিবার জন্য আমাদের অনেক রকম লোকের সহিত যোগাযোগ রাখিতে হইত। এই চুড়ি-ওয়ালী ভগ্নী দুইটি আমাকে অনেক খবর আনিয়া দিত। তাহারা আমাকে গুরুর মতো ভক্তি করিত, আমিও তাহাদের স্নেহ করিতাম। আমি গিয়া সেই হতভাগিনী বালিকার মৃতদেহটি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, তাহার মা-ও আমার সঙ্গে গিয়াছিল। আমরাও অনেক খুন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ বীভৎস ব্যাপার আমাদের-ও জীবনে ঘটে নাই। কন্যার এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাহার মা কিন্তু এক বিন্দু চোখের জল ফেলে নাই। তাহার দৃষ্টি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়াছিল। এই দুই ভগ্নি 'জিপ্‌সি' জাতের মেয়ে, ইহাদের নীতিজ্ঞান খুব বিশুদ্ধ নয়, তাছাড়া ইহারা ভয়ানক প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহারা আমাকে বলিল ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, আমি যেন তাহাদের সাহায্য করি।

সেইদিন হইতে ঐ দুইটি নর-রূপী পিশাচের আমি পিছু লইয়াছি। উহাদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। উহাদের একদিনও চোখের আড়াল করি নাই। উহারা যখন শেরপুরে জমি কিনিয়া বসবাস আরম্ভ করিল, তখন আমিও উহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলাম এবং প্রচার করিলাম যে আমিও জমি কিনিয়া তাহাদের প্রতিবেশী হইব। কিছুদিন আলাপ করিয়া বুঝিলাম উহাদের কাম-প্রবৃত্তি এখনও প্রশমিত হয় নাই। যুবতী নারী দেখিলে

এখনও উহারা লোলুপ হইয়া ওঠে এবং ছলে বলে কৌশলে তাহাঁকে নিজেদের আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা করে। আমি উহাদের এই কামপ্রবৃত্তির সুযোগ লইলাম। যাহার কন্যাকে উহারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল সে গিয়া উহাদের সহিত বসবাস করিতে রাজি হইল। জিপ্‌সি মেয়েদের মোহিনী শক্তি উহার ছিল, সুতরাং বেশী বেগ পাইতে হইল না। একদিন চুড়ি বিক্রয় করিবার ছলে সে কালিপ্রসাদবাবুর বাসায় গেল এবং আর ফিরিল না। সেখানেই রক্ষিতারূপে থাকিয়া গেল। ইহার দিন দশেক পরে একদিন দেখিলাম কালিপ্রসাদবাবু বাম চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঘুড়িয়া বেড়াইতেছেন। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন তিনি একটা জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন হঠাৎ একটা বাঘিনীর দেখা পান, বাঘিনীটা চোখে একটা থাবা মারিয়াছে। আমি মনে মনে হাসিলাম, বুঝিলাম বাঘিনীটি কে। আলিঙ্গনাবদ্ধ ছুকৃরিরই নখরাঘাতে তাহার চক্ষুটি নষ্ট হইয়াছিল। আমি ছুকৃরিকে সাবধান করিয়া দিলাম, প্রকাশ্যভাবে সে যেন আর কিছু না করে। কিন্তু ওই লোক দুইটা এমন কামান্ধ ছিল যে ওই ঘটনার পরও তাহারা ছুকৃরিকে বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেয় নাই। ছুকৃরির মুখ হইতেই আমি খবর পাই যে, উহারা উভয়েই পুরুষত্বহীন। তখনও আমি ঠিক করিতে পারি নাই, কি উপায়ে উহাদের হত্যা করিব। এমন সময় হঠাৎ এক পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া গেল। কিছুদিন আমি সাপুড়ের ছদ্মবেশে সাপুড়েদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ভজুয়া নামক যে লোকটিকে আপনারা দেখিয়াছিলেন সে আমার পূর্বপরিচিত একজন সাপুড়ে। তাহাকে পূর্বে আমি কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলাম। আমাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিয়া সে পুলকিত হইল, আমার বাসাতেই আসিয়া আড্ডা গাড়িল এবং নিজের নানা দুঃখের বর্ণনা করিয়া অবশেষে কিছু অর্থ ভিক্ষা করিল। দেখিলাম তাহার নিকট একটি প্রকাণ্ড গোক্ষুর এবং একটি প্রকাণ্ড নেউল রহিয়াছে। নেউল ও সাপের খেলা দেখাইয়া সে অর্থোপার্জন করে। সাপটা দেখিয়া আমি ভয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু সে বলিল সাপের বিষদাঁত নাই, কয়েকদিন অন্তর অন্তর সে বিষদাঁত ভাঙিয়া দেয়। ভজুয়াকে কাজে

লাগাইব স্থির করিলাম। সাপ ও নেউল দুইটি ঝুড়িতে আমার পিছন দিকের একটি ঘরে বন্দী রহিল। ভজুয়াকে তখন সমস্ত কাহিনী খুলিয়া বলিলাম। কেবল অর্থের লোভে নহে, এই বীভৎস কাহিনী শুনিয়া ওই পিশাচ দুইটিকে শাস্তি দিবার আগ্রহেও সে আমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। আমি তখন প্ল্যান ঠিক করিলাম। তাহাকে বলিলাম 'প্রথমে উহাদের কাছে গিয়া বলিতে হইবে যে তুমি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির দেশী ঔষধ জান। ধাতু-দৌর্ব্বল্য, প্রমেহ প্রভৃতি ব্যাধির অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ তোহার নিকট আছে। ইহাও তোমাকে বলিতে হইবে যে অর্থাভাবে তুমি কষ্ট পাইতেছ, যে কোনও কাজ পাইলে পেটভাতাতেও তুমি করিতে প্রস্তুত আছ। খুব সম্ভব ইহা শুনিয়া উহারা তোমাকে বহাল কবিবে। তাহার পর তোমাকে চিকিৎসা শুরু করিতে হইবে। প্রথম প্রথম কিছুদিন উহাদের মদনানন্দ মোদক খাওয়াও। কিন্তু শেষ দিন একটু বেশী পরিমাণে আফিং খাওয়াইতে হইবে। সেই দিন তোমার সাপটাও একজনেব ঘরে ছাড়িয়া দিয়া লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে যে সর্পাঘাতে উহার মৃত্যু হইয়াছে। একটা ছুঁচ লইয়া উহার পায়ের পাতায় দুইটা ক্ষতচিহ্ন করিয়া দিলে কাহারও কোন সন্দেহ হইবে না। মেয়েটির মায়ের একান্ত ইচ্ছা উহাদের চোখও উপড়াইয়া লইতে হইবে, না লইলে প্রতিশোধ পূরা হইবে না। সুরনাথের ঘরে যখন সাপ লইয়া সকলে ব্যস্ত থাকিবে তখন অহিফেন-বিষে অজ্ঞান কিম্বা মৃত কালিপ্রসাদের চোখটা ছুকৃরি অনায়াসে উপড়াইয়া ফেলিতে পারিবে। চোখ ওপড়ানো হইয়া গেলে তোমার নেউলটার মুখে এবং সামনের পায়ে রক্ত লাগাইয়া পাশের ঘরে সেটাকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে অনেক বোকা লোকের হয়তো ধারণা হইবে যে, নেউলটাই কালিপ্রসাদের চক্ষুটি নষ্ট করিয়াছে। ছুকৃরির ইচ্ছা সুরনাথের চোখ দুইটাও সে উপড়াইবে। যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টাও আমরা করিব।'

আশা করি ব্যাপারটা এইবার আপনার নিকট পরিষ্কার হইয়াছে। আর একটা কথা বলিয়া পত্র শেষ করি। এ-পত্রের হস্তাক্ষর আমার নয়। ছুকৃরি, ভজুয়া এবং বকৃশী এ নাম তিনটিও ছদ্মনাম। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা

করিবার জন্যই আমরা এই নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলাম। আপনাদের আইনের চক্ষে আমরা অপরাধী। একটা সান্ত্বনা শুধু আছে উপর-ওয়ালার আইনে হয়তো আমরা ছাড়া পাইব। ইতি—

বক্‌শীবাবু

এই চিঠি পাইবার মাসখানেক পরে আমি ট্রেণে করিয়া একটা এন্‌কোয়ারি করিতে যাইতেছিলাম। মাঠের মাঝখানে ট্রেণটা থামিয়া গেল শুনিলাম একটা লোক কাটা পড়িয়াছে। ট্রেণ হইতে সকলে নামিয়া পড়িলাম। নামিয়া শুনিলাম লাইনের মাঝখানে একটা কুকুর ছানা আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই কুকুর ছানাটাকে বাঁচাইবার জন্য একটা লোক ছুটিয়া আসে এবং কুকুর ছানাটাকে দূরে ফেলিয়া দেয়, কিন্তু নিজে সে পড়িয়া যায়। ড্রাইভার সময় মতো গাড়ি থামাইয়া ফেলিয়াছিল তাহা না হইলে কাটা পড়িত। ভীড় ঠেলিয়া আগাইয়া দেখিলাম ভজুয়া এবং একটি জিপ্‌সি মেয়ে একটি বলিষ্ঠ যুবককে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। যুবকটির মাথা হইতে রক্ত পড়িতেছে, জ্ঞান নাই। রেলের ধারে মাঠের মাঝখানে একটি জিপ্‌সিদের তাঁবু দেখিলাম। তাঁবুর সম্মুখে একটি কুক্কুরী তাহার নধর শাবকটিকে স্তন্যপান করাইতেছে।

সেদিন আমি ভজুয়া, ছুকরী এবং বক্‌শীবাবুকে ধরিতে পারিতাম। কারণ ওই বলিষ্ঠ যুবকটিই যে বক্‌শীবাবু তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি কিছুই করিলাম না। ভীড়ের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া মুগ্ধ নেত্রে কেবল চাহিয়া রহিলাম। জীবনে যে দুই চারিটি সৎকার্য করিয়াছি এইটি মনে হয় তাহার মধ্যে অন্যতম।





শান্তি-র বই ঃ

যেতে নাহি দিব (উপন্যাস)

সুন্দর, হে সুন্দর (উপন্যাস)

মেঘ ও চাঁদ (কিশোর উপন্যাস)

শিখারূপিণী (উপন্যাস)-যন্ত্রস্থ

রবীন্দ্রনাথের
সোনার তরী (আলোচনা)

গল্পকার শরৎচন্দ্র (আলোচনা)

রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা (আলোচনা)

বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা (আলোচনা)-যন্ত্রস্থ

ঊর্মিমালা (গল্প)